Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামিক প্যারেন্টিং

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুওয়াইবা ইসলাম সাবা

রোলঃ 228020995

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামিক প্যারেন্টিং

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুওয়াইবা ইসলাম সাবা

রোলঃ 228020995

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামিক প্যারেন্টিং " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুওয়াইবা ইসলাম সাবা, আইডিঃ 228020995 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলামিক প্যারেন্টিং ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সুওয়াইবা ইসলাম সাবা

আইডিঃ 228020995

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

Contents

- ভুমিকা 3
- চাইল্ড অ্যাবিউজ 5
- শিশুদের শাস্তি দেওয়া 15
- শিশুদের মনোজগতে শাস্তির প্রভাব 17
- পিতামাতার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক মন্তব্যের উদাহরণ 20
- সরাসরি অভিযোগ করবেন না 21
- ফলাফলকে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করুন 22
- ছোটদের বুঝ ও ভুলগুলোকে তিনি প্রজ্ঞার সাথে ঠিক করে দিতেন 24
- নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করুন 26
- শিশুদের তিরস্কার ও ধমক দেওয়া থেকে তিনি দূরে থাকতেন 28
- শাসনের প্রয়োজনে শাস্তি 30
- শিশুকে যখন তিনি শাস্তি দিতেন কোমল ও আদুরে ভঙ্গিমায় তা দিতেন 31
- শিশুদের প্রহার করার উপকারিতা 32
- প্রহারের নীতিমালা 33
- জীবন কখনো পশ্চাৎমুখী নয় 36
- আয়নার প্রতিচ্ছবি 38
- পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন কাজ 'শিশু হওয়া' 40
- মনোযোগ পাওয়া 43
- তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ 45
- পরিবারের মধ্যে সন্তানের অবস্থান 46
- একটু বুকে টেনে নাও না মা! 47
- শিশুদের কাউন্সেলিং 49
- শিশুদেরকে চাপিয়ে না দিয়ে বোঝাতে হবে 52
- করুণা, দয়া এবং নম্রতা 57
- সবসময় প্রতিশ্রুতি রাখুন 59
- বাচ্চাদের তাদের অনুভূতি প্রকাশ এবং আনন্দ-বেদনা ভাগাভাগি করার সুযোগ দিন 61
- ভালোবাসার শিক্ষা 63
- গোল্ডেন ওয়ার্ড-লাভ ইউ 66
- গোল্ডেন ওয়ার্ড—থ্যাংক ইউ 68

❖ গোল্ডেন ওয়ার্ড—সরি....70
❖ শিশুদের গড়ে তোলা....72
❖ নির্দেশনা, শিক্ষা, কৌশল....75
❖ শিশুদের নিয়মানুবর্তিতা....77
❖ দেয়াল জুড়ে রেললাইন....79
❖ গল্পে গল্পে বাচ্চাদেরকে শেখানো....81
❖ আল্লাহর সাথে শিশুর সম্পর্ক তৈরি....86
❖ তিনি শিশুকে তাওহিদের কালিমা শেখাতে আদেশ করেছেন....90
❖ সন্তানকে কোরআন শিক্ষাদান....92
❖ তিনি ছোটদেরকে রাসূলের ভালোবাসা, নবি-পরিবারের ভালোবাসা, সাহাবায়ে কেরামের ভালোবাসা এবং কোরআন তিলাওয়াত শিখিয়েছেন....94
❖ দুঃখ ও মুসিবতের সময় তাদের আল্লাহ তাআলার সাথে জুড়ে দিয়েছেন....96
❖ তিনি তাদের আরবি ভাষা শেখাতে যত্ন নিয়েছেন....98
❖ সুন্নাহ শিক্ষাদান....99
❖ শিশুদের বিনোদন ও খেলাধুলা....100
❖ শিশুকে সক্ষম হতে এবং দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করুন....103
❖ সাহসিকতা তৈরি এবং আক্রমণে দক্ষতা সৃষ্টির জন্য তিনি ছোটদের সামরিক প্রদর্শনী করেছেন....107
❖ শিশুরা যখন অভিভাবক....108
❖ সন্তানের সাথে পরামর্শ করুন....110
❖ তিনি কখনো তাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন....112
❖ সৎ শিক্ষক নির্বাচনের প্রতি তিনি গুরুত্বারোপ করেছেন....115
❖ শিক্ষকের প্রতি ভালোবাসা....117
❖ শিশুদের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে জ্ঞানপিপাসা....119
❖ সন্তানের বেড়ে ওঠা, যোগ্য হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে আবশ্যিক দিকগুলোর যত্ন নেওয়া দরকার....122
❖ উপসংহার....123
❖ তথ্যসূত্র....124

❖ ভুমিকা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان، ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين؛ أما بعد
শুরু ও শেষে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যার তৌফিকে এই থিসিস পেপারটি সমাপ্ত হয়েছে।

জীবন সংসার সামলে সন্তান প্রতিপালন করতে গিয়ে বাবা-মায়েদের অনেক কঠিন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়। সন্তানের শরীরের যত্ন নেওয়া, মনের পরিচর্যা করা, তার ভিতরে ভালো কাজের বোধ তৈরি করা, মন্দ কাজের ব্যাপারে সতর্ক করা, তাকে ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য শিখিয়ে নেওয়া—সর্বোপরি সন্তানকে দ্বীন ও নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া প্রত্যেক বাবা-মায়ের অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ তায়া'লা বলেন:

يا أيها الذين امنوا قوا انفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
"হে ঈমানদারগ, তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর"। [সূরা আত-তাহরিম, ৬৬ : ৬]

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, পরিবার-পরিজনকে শিষ্টাচার শিখাও, তাদেরকে ইলম শিক্ষা দাও।

কালের ঘুর্ণাবর্তে সব কিছুর পালাবদল ঘটছে। পরিবর্তন আসছে জীবনের রূপ ও রঙে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন চিন্তা এসে গ্রাস করছে পুরনো চিন্তার জগৎ। এভাবেই চলছে গ্রহণ-বর্জনের নিরন্তর চক্র।

কালের এই চক্রে সব কিছুতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগলেও একমাত্র ইসলাম-ই ১৪০০ বছর ধরে চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান বিকাশের অবিকৃতি ও পরিপূর্ণ ধারায় রয়েছে বিরাজমান। মানবজাতির জন্য নির্দেশিকা হিসেবে নাযিল হওয়া ইসলামের বার্তা সমূহ রয়েছে সমসাময়িক ও আগামী জীবনের উপযোগিতা। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এতে শিশুকাল থেকে বৃদ্ধকাল এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত; বরং জন্মের পূর্ব থেকে নিয়ে মৃত্যু-পরবর্তী সকল দিকনির্দেশনা বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহ বিদ্যমান।

হাদীস শরীফে অত্যন্ত চমৎকার বর্ণনা রয়েছে—

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او او يمجسانه

"হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রতিটি নবজাতক ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর পিতামাতাকে ইহুদি অগ্নিপূজক বানায়।" [সহীহ বুখারী : ১৩৮৫; সুনানে আবু দাউদ : ৪৭১৪; সুনানে তিরমিজি : ২১৩৮]

মানুষের সৃষ্টি ও গঠনের ভিত্তি আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত চমৎকার ভাবে স্থাপন করেছেন। উক্ত ভিত্তির উপর সঠিকভাবে মানবসৌধ নির্মাণ করা হলে খুবই উত্তম মানুষসৌধ নির্মিত হবে। কিন্তু ভিত্তি যত সুদৃঢ়ই হোক, তাতে দুর্বল করে প্রাচীর বানানো হলে সেই প্রাচীর দুর্বল কিংবা বাঁকা অথবা খারাপ হবেই।

বর্তমান যুগে পশ্চিমা সংস্কৃতির যত আগ্রাসন ধাবমান হয়েছে এবং আইয়ামে জাহিলিয়াত তথা বর্বরতার যুগে মানবসৌধের যে নিয়ম-নীতি প্রচলন হয়েছে, তাতে মানুষ মানবিক বৈশিষ্ট্যের উচ্চ লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে চলে যায়। এতে মানুষের ব্যক্তিজীবনের শারীরিক প্রয়োজন ও শক্তির প্রতি যদিও অনেক লক্ষ রাখা হয়েছে, কিন্তু মানুষের উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে খুবই হীন বোঝানো হয়েছে; অথচ এটি মানুষের অনুভূতি ও উত্তম মানবিক অভ্যাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

আমাদের এই বৈরি সময়ে ভবিষ্যৎ-প্রজন্মকে ইসলামের পথে চলতে উৎসাহিত করাটা সময়ে দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পারিবারিক অঙ্গনেও এ প্রচেষ্টা থাকা উচিত। কারণ পরিবারে শিশুরা যদি সুশৃঙ্খল পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বড় হয়, তাহলে সাধারণত তাদের ভিতরে মানবিক মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্বের পরিপন্থী কোন আচরণ সহজে ঢুকতে পারে না। তাই শিশুদেরকে পারিবারিক পরিবেশে ন্যায়, নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, সত্যবাদীতা সহমর্মিতা, স্বাস্থ্য-সচেতনতা, জ্ঞানানুরাগ, ধর্মীয় অনুশাসন ও রীতিনীতির মধ্য দিয়ে বড় করে তুলতে হবে কারণ মানব জীবনকে সূর্যমণ্ডিত করে তুলতে হবে। কারণ মানুষ হতে প্রয়োজনীয় অধিক মূল্যবোধ ও মনুষত্ব অর্জন।

সন্তানের সুখী ও সুন্দর ভবিষ্যতের আশায় মা-বাবা অবলীলায় যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকেন। তবে বেশিরভাগ সময়ে বাবা-মায়েরা সন্তানের আসল ভবিষ্যৎ অর্থাৎ

পরকালের কথা ভুলে যান। ফলে সন্তানদের পরকালই শুধু ঝুঁকির সম্মুখীন হয় না; বরং তাদের দুনিয়ার জীবনও ভুল পথে চালিত হয়।

বাবা-মায়ের সাথে বাচ্চাদের যদি খুব সুন্দর একটা সহজ-সরল-বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে, বাবা-মায়েরা যদি খুব আন্তরিক একটা ভালোবাসা-মেশানো শ্রদ্ধাবোধ সন্তানদের মনে বুনে দিতে পারেন, তাহলে বাচ্চাদের গড়ে তোলাটা অনেক বেশি সহজ হয়ে যায়। এ কথাটি দেশ-বিদেশ সব জায়গাতেই সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে এটি কেবল তখনই সম্ভব, যখন আমরা বাবা-মায়েরা বাচ্চাদের সঠিক জীবনবোধ দিতে পারব, তাদেরকে জাগ্রত বিবেকের আলোয় আলোকিত পথে চলতে শেখাতে পারব। আর এজন্য সবার আগে প্রয়োজন বাবা-মায়েদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। বাচ্চাদেরকে যদি শুধু 'আমি মুসলিম' এই একটি বাক্য মর্মসহ শেখানো যায়, তাহলেই তারা সমস্ত বৈরিতা তুচ্ছ করে নিজ প্রবৃত্তিকে জয় করতে পারে। এই একটি বাক্যের প্রকৃত উপলব্ধিই যথেষ্ট যেকোনো মানুষকে সমস্ত দীনতা-হীনতা, স্বার্থপরতা ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রাখার জন্য। ইসলাম হলো সেই জীবনব্যবস্থা, যার মধ্যে শুধু কল্যাণই রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وان تطيعوه تهتدوا

"আর যদি তার অনুসরণ করো তাহলে হেদায়েত পেয়ে যাবে।" [সূরা আন-নূর, ২৪ : ৫৪]

আর ইসলাম বা শরিয়তের পূর্ণ জ্ঞান এমন এক শক্তি, যা মানুষের রক্ষাকবচ হয়ে কাজ করে। বাচ্চাদের মনে এই জ্ঞান ঢোকানো কঠিন কিছু নয়। কাদামাটি যখন নরম থাকে, এটাকে যেকোনো আকার দেওয়া যায়। যেভাবে আকার দিবেন সেরকমই হবে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সেই কাদামাটি শক্ত হয়ে যায়, তখন চাইলেও তাকে ভিন্ন কোন আকার দেওয়া যায় না। জোর করে ভিন্ন কোন আকার দিতে চাইলে ভেঙ্গে যায়।

শিশুরা হলো কাদামাটির মতো। ছোট থেকে ইসলামিক মূল্যবোধে বড় না করলে, আর হতো সুযোগ পাওয়া যাবে না।

পৃথিবীর প্রতিটি বাবা মাকে আল্লাহ তৌফিক দান করুন তাঁদের সন্তানদের ইসলামিক জীবনব্যবস্থায় বড় করে তোলার। প্রতিটি সন্তান যেন কেয়ামতের কঠিন দিনে বাবা মায়ের নাজাতের উছিলা হতে পারে।

❖ চাইল্ড অ্যাবিউজ

পৃথিবীর সব বাবা-মা সন্তানের ভালো চান। সন্তান যাতে ভালো হয়, তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু শিশুদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। শিশুদের আচরণগত বৈচিত্র্যের চেয়েও বেশি দেখেছি বাবা-মায়েদের বৈচিত্র্যময় আদর, সোহাগ, ভালোবাসা ও শাসন। জেনে বা না জেনে, বুঝে বা না বুঝে বাবা-মায়েরা বাচ্চাদের ওপর নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করেন। শারীরিক আঘাত চোখে দেখা যায়, ফলে বাবা-মা তাতে মলম লাগাতে পারেন বা চেষ্টা করেন; কিন্তু মানসিক আঘাত!

এই আঘাতের কারণেই শিশুদের মানসিকতার সঠিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। যেখানে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তারা বস্তুগত গুণাবলি ও ঘটনা সম্পর্কে ধারণা বা উপলব্ধি লাভ করে। এর ওপর নির্ভর করেই তাদের মধ্যে জন্ম নেয় স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতা ও বিচারবুদ্ধি।

আমার পরিচিত একটি বাচ্চা আছে, সে কোনো কিছুতেই মনোযোগ দিতে পারে না, স্থির হয়ে বেশিক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না, কিছু করতে বললে সব এলোমেলো করে ফেলে, সামান্যতেই রাগ করে কান্না জুড়ে দেয়। একটু বেখেয়ালি স্বভাবের, তাই খুব বেশি ভুল করে।

বাচ্চাটির বাবা-মাকে যদি ছেলেকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়, তাহলে তারা দুজনই ভীষণ বিরক্ত হন এবং রাগ করেন। মোটকথা তারা মানতেই রাজি নন, তাদের বাচ্চাটি এডিডি বা অ্যাটেনশন ডেফিসিট ডিজ-অর্ডারের শিকার। কেউ বোঝাতে গেলে উল্টো তাদের সাথে মনোমালিন্য হয়। অথচ সন্তানের প্রতি তাদের ভালোবাসার কোনো কমতি নেই। বাচ্চা যা চাইছে, বলার সাথে সাথে তা সামনে এনে হাজির করছেন। কিন্তু মানুষ বলবে, 'তাদের বাচ্চাটা স্বাভাবিক না' —এ ভয়ে বাচ্চাকে তারা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান না বা বিষয়টি নিজেরাও মানতে চান না। প্রতিবেশী একজনকে দেখেছি, বাচ্চা কিছু করতে না চাইলে নানাভাবে ভয় দেখিয়ে তাকে সে কাজটি করতে বাধ্য করেন। কেউ কেউ সারাক্ষণ টিভি চ্যানেল আর ফোনালাপ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন, বাচ্চা কাছে এসে কথা বলতে চাইলেও ধমক দিয়ে অন্যদিকে পাঠিয়ে দেন।

একজন মাকে দেখেছি, বাংলাদেশ থেকে জালিবেত নিয়ে এসেছেন নিজের পাঁচ বছর বয়সি মেয়েকে শায়েস্তা করার জন্য।

এক মা বুকফাটা কান্নার সাথে জানিয়েছেন, তার সাত বছর বয়সি ছেলেটাকে তার স্বামী সামান্য কারণেই মাথায় তুলে সোফা বা বিছানায় ছুড়ে ফেলেন, কখনো লাথি পর্যন্ত মেরে বসেন।

যেকোনো ধরনের আচার-ব্যবহার বা কাজ —যা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে বা ভালে থাকায় বাধা দেয়, তাকেই এককথায় 'চাইল্ড অ্যাবিউজ' বলে। চাইল্ড অ্যাবিউজারে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে—

» **ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ:** যেকোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণহীন শারীরিক আঘাত।

» **সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ:** শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে যেকোনো ধরনের যৌন সংসর্গ।

» **বিহেভিয়ার অ্যাবিউজ:** শিশুর প্রতি অবহেলা ও অমনোযোগিতা।

» **ইমোশনাল অ্যাবিউজ:** নানাভাবে শিশুকে কোনো কিছুতে বাধ্য করা।

এই প্রত্যেকটি কারণেই শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে এগুলো নিয়ে এখানে আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

❖ চাইল্ড ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ

সন্তানদের ভালোর জন্য প্রয়োজনে বাবা-মাকে দৃঢ় হতে হয়। এটা অবশ্যই ভালে বিষয়। বাবা-মায়ের দৃঢ়তা সন্তানদের মনে নিরাপত্তাবোধ জন্ম দেয়। কিন্তু ছেলেমেয়েরা যখন কথা শোনে না বা অবাধ্যতা করে, তখন তাদেরকে সঠিক পথে আনতে বাবা-মায়েরা যে কাজটি করেন, তার নাম 'শাসন'। শাসন বলতে সবাই বোঝে—বকাঝকা করা, শারীরিক শাস্তি দেওয়া বা পছন্দের জিনিস দেওয়া বন্ধ করা। শাসনর পক্ষে বাবা-মায়েদের কাছে নানা ধরনের যুক্তি থাকে। যেমন: মাঝে মাঝে শাষন না করলে বাচ্চারা মানুষ হয় না, সাহস বেশি বেড়ে যায়,

ছোটবেলায় আমাদের বাবা-মায়েরাও আমাদের শাসন করেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ শাসন আর গায়ে হাত তোলা কিন্তু এক নয়। বাচ্চাদেরকে তাদের ভুল বা অন্যায়গুলো অবশ্যই ধরিয়ে দিতে হবে, তবে এর সাথে গায়ে হাত তোলার কোনো সম্পর্ক নেই।

একবার আমি দেখেছিলাম, মেহমানদের জন্য সাজিয়ে রাখা খাবার ধরার কারণে আড়াই বছর বয়সি একটি মেয়েকে তার বাবা ঘরভরতি মানুষের সামনে চড় লাগিয়ে দিয়েছিল। মেয়েটি তারপর নিষ্পাপ দৃষ্টিতে বাবার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিল, যেনো কেন তাকে চড় দেওয়া হয়েছে, সে তা বুঝতে পারছে না।

এমনও হয়, বাসায় টিচার এলে বাচ্চা পড়তে চায় না, তাই চার বছর বয়সি মেয়েকে মা টিচারের সামনেই লাঠিপেটা শুরু করে দেয়।

স্কুল থেকে ডেকে টিচাররা যদি অভিযোগ করে বলেন—আপনার বাচ্চা ক্লাসে অমনোযোগী থাকে। তাহলে আর দেখে কে। বাসায় ফিরেই চড়-থাপ্পড়ের বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় বাচ্চাটার ওপর।

ছয় বছরের ছেলেটা তার তিন বছর বয়সি বোনের সাথে খেলনা শেয়ার করতে রাজি না হলেই তাকে শারীরিক আঘাতের শিকার হতে হয়।

ঘরের কোনো জিনিস নষ্ট করলে তো আর রক্ষা নেই!

এমন আরও অসংখ্য ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে বাচ্চাদের সাথে। অথচ এই ব্যাপারগুলো সমাধানের সাথে শারীরিক আঘাতের কোনো সম্পর্ক নেই। শারীরিক আঘাত এর সমাধানও নয়।

পরীক্ষায় নম্বর কম পেলে, ঘরের কোনো জিনিস নষ্ট করলে, ছোট ভাই বা বোনের সাথে বনিবনা না হলে, কথা শুনতে না চাইলে, অবাধ্যতা ইত্যাদি করলে আমাদের দেশে বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলার বদলে গায়ে হাত তোলার যে সংস্কৃতি প্রচলিত আছে, এতে আসলে তেমন কোনো লাভ হয় না। এর দ্বারা বরং বাচ্চারা শুধু শরীরে ব্যথা পায়: কিন্তু কেন ব্যথা পেল তা বুঝতে পারে না। ফলে একই কাজ বারবার করে এবং বারবার শাস্তি পায়। এর ফলে বাচ্চাদের মনে বাবা-মায়ের প্রতি চাপা ক্ষোভসৃষ্টি হয়ে তা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। তারপর

একটা সময় অতি আদরের বাচ্চাটি তার বাবা-মায়ের কথাই সহ্য করতে পারে না আর। তাদের স্বভাবে ও আচরণে এমন পরিবর্তন আসে, এরপর থেকে তারা ইচ্ছে করে কথা শোনে না বা দুষ্টুমি করে। কারণ তখন তার চিন্তা থাকে—খুব বেশি হলে আমাকে ধরে পিটুনি দেওয়া হবে, এই তো!

তাই বাচ্চারা কোনো অন্যায় করলে তাদের বোঝাতে হবে। কেন এই কাজটা করা ঠিক নয়, এর প্রভাব কী হতে পারে—ইত্যাদি শেখাতে হবে। মনে রাখবেন, শারীরিক আঘাতের চেয়ে শিশুকে বোঝানোটা অনেক বেশি ফলপ্রসূ।

শাসন আর অ্যাবিউজ কিন্তু এক জিনিস নয়। শাসন হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে শিশুর ভুল বা অন্যায়গুলো ধরিয়ে দিয়ে তাকে তা থেকে বের হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, শাসনের নামে আমাদের বাচ্চারা প্রতিনিয়ত অ্যাবিউজের শিকার হচ্ছে, যার ফলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তার সুষ্ঠু বিকাশ।

বাবা-মা শাসন করতে গিয়ে বাচ্চাদের গায়ে হাত তুললেই যে সব ঠিক হয়ে যায় ব্যাপারটা মোটেও এমন নয়; বরং এর ফলে তারা আরও জেদি হয়ে ওঠে। যারা বাচ্চাদেরকে বোঝাতে পারেন না বা শেখাতে পারেন না, তারাই আসলে শাসনের নামে গায়ে হাত তোলেন। কিন্তু এভাবে সন্তানদের মানুষ করা যায় না। অনেকে নিজেদের চরিত্রের অযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রণহীনতাকে শাসনের নামে চালিয়ে দেন, যা প্রকৃত অর্থে চাইল্ড ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ।

সামান্য কারণে যে বাচ্চাটার গায়ে আমি হাত তুলছি, তার শরীরের সাথে সাথে ছোট্ট মনটাকেও কিন্তু আঘাতে জর্জরিত করে ফেলছি! যখন তার স্নেহ, মমতা, সহমর্মিতা ও ভালোবাসা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তখন ও পাচ্ছে শাসনের নামে চড়-থাপ্পড় ও বকাঝকা!

একটা বয়সে গিয়ে যখন আমার নিজের স্নেহ, মমতা, সহমর্মিতা ও ভালোবাসা প্রয়োজন হবে, তখন কি সন্তানের কাছ থেকে সেটা আমার প্রাপ্য মনে করাটা অন্যায় হবে না? আমার আজকের আচরণই আমার সন্তানের আগামীর পাথেয়—এ বিষয়টি যেন আমরা ভুলে না যাই।

❖ চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ

চাইল্ড অ্যাবিউজ নিয়ে কথা বলছিলাম প্রতিবেশী কয়েকজন ভাবির সাথে। সবাই চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর এক ভাবি আবার ফিরে এলেন। চেহারা দেখেই বুঝতে পারলাম, কিছু বলতে

চান। বেশ সময় নিলেন তিনি নিজেকে গুছিয়ে নিতে। তারপর বললেন, ভাবি, আমি যখন ছোট ছিলাম, আমাদের বাসায় আমার দূরসম্পর্কের এক মামা থাকতেন। তিনি আমাকে খুব আদর করতেন, জড়িয়ে ধরতেন, আমার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় হাত দিতেন! এসব কি তাহলে অ্যাবিউজ ছিল? আমি তো তখন অনেক ছোট ছিলাম। মাত্র আট বছর বয়স ছিল।

বেশিরভাগ সময় আড়ালেই করেছেন। তবে মাঝে মাঝে আব্বু-আম্মুর সামনেও আমাকে আদর করে ফেলতেন তিনি। আব্বু-আম্মু কখনো কিছু বলেননি এটা নিয়ে। বলেন না ভাবি, আমি কি অ্যাবিউজের শিকার তাহলে? সংসার-জীবনে খুব সুখী এই মেয়েটিকে 'সে অ্যাবিউজের শিকার ছিল'—এটি বুঝিয়ে বলতে আমার অনেক কষ্ট হয়েছে। এখন মেয়েটা সেসব ভেবে নীরবে কান্না করে।

যখন ক্লাস টেনে পড়তাম, তখনকার ঘটনা। আমার সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবীটা ছিল ক্লাসে বাকি সবার চেয়ে বেশি আমুদে। হঠাৎ একদিন তাকে ভীষণ চুপচাপ দেখে 'কী হয়েছে' জানতে চাইলাম। অনেক করে জিজ্ঞেস করার পর বলল, দুই সপ্তাহ ধরে আমার আব্বুর এক বন্ধু আমাকে টিউশন করাচ্ছেন। প্রথম থেকেই লোকটা একটু কেমন যেন। প্রথমে ড্রইংরুমে বসে পড়তাম। কিন্তু তিনি 'শুধু বেডরুমে বসে পড়লে পড়ায় মনোযোগ বেশি আসে'—এমন নানা কথা বললে পড়ার সুবিধার কথা চিন্তা করে বেডরুমে পড়ার পারমিশন দেন আম্মু। তারপর থেকে তিনি পড়ার ফাঁকে ফাঁকে নানা ধরনের নোংরা জোকস বলা শুরু করেন। গতকাল আমাকে বললেন, তুমি এত ঢেকেঢুকে বসো কেন? আরও একটু খোলামেলা হয়ে বসবে, এতে দেখতে সুবিধা হয়। আমি এখনই কিছু না করলে লোকটা আরও সাহস পাবে। শুধু লজ্জার কারণে আবু-আম্মুকে বলতে পারছি না এসব কথা।

বিস্তারিত শুনে আমরা কয়েকজন বান্ধবী মিলে তার আম্মুকে বিষয়টা খুলে বলেছিলাম।

এমন অসংখ্য ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে আমাদের চারপাশে। বাবা-মায়ের চোখের সামনে তাদের আদরের সন্তানটি অ্যাবিউজের শিকার হচ্ছে। কিন্তু তারা বাধা দেওয়া তো দূরে থাক, টেরই পাচ্ছেন না। সন্তানকে যাদের কাছ থেকে আগলে রাখার কথা ছিল, অজ্ঞতার কারণে নিজেরাই ঠেলে দিচ্ছেন তাদের কাছে।

এই ধরনের ঘটনাগুলো বেশিরভাগই ঘটে ঘরের একান্ত কাছের আত্মীয়স্বজনদের মাধ্যমে। যারা আদরের ছলে এমন সব বিকৃত কাজ করে, শিশুরা অস্বস্তিবোধ করলেও ঠিক বুঝে

উঠতে পারে না—সেগুলো আদর না অন্যকিছু। ফলে, তারা কারও কাছে বিষয়টা জানায় না বা এটা যে জানাতে হবে, তাও বুঝতে পারে না।

ঘরের মানুষ ছাড়াও যারা শিশুদের কাছে আসার সুযোগ পায়—যেমন: বাসার কাজের মানুষ, গৃহশিক্ষক, আশেপাশের বাড়ি বা ফ্ল্যাটের বাসিন্দা, স্কুলের কেউ—এই রকম সবার ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। শিশুটি ছেলে হোক বা মেয়ে, উভয়ই এই ধরনের অ্যাবিউজের শিকার হতে পারে। আর এসব ঘটনা থেকে তাদের মধ্যে তৈরি হতে পারে নানা ধরনের ছোট-বড় মানসিক সমস্যা, হীনম্মন্যতা, ব্যক্তিত্বহীনতা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ। কেউ কেউ মারাত্মক কিংবা অপূরণীয় শারীরিক ক্ষতির শিকারও হয় এসবের ফলে।

শিশুদের যাতে এই ধরনের জঘন্য হয়রানির শিকার হতে না হয়, সেজন্য সবার প্রথমে বাবা-মাকে সচেতন হতে হবে। কে কী মনে করবে, এসব চিন্তা করে দ্বিধাদ্বন্দ বা লজ্জায় না ভুগে ঘরে অবস্থানরত অন্যান্য সদস্যকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে, শিশুদের কী পরিমাণ আদর করা যাবে। শিশুদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে, কোন ধরনের আদরগুলো পচা, শরীরের কোন কোন অংশে কাউকে ছুঁতে দেওয়া যাবে না। বাবা-মাকে অবশ্যই সন্তানদের সাথে এমন সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, যাতে শিশুরা তাদের কোনো কথা বাবা-মাকে বলতে দ্বিধা না করে।

বাচ্চারা যদি কারও সাথে বাইরে যায়, ফিরে আসার পর প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে বাইরে কী হয়েছে, কী দেখেছে, কী করেছে। তার মানে এই নয়, আমরা প্রতিই সম্পর্ককেই সন্দেহের চোখে দেখব। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, বিভিন্ন কেস স্টাডি থেকে দেখা গেছে, এই ধরনের বিকৃত মানসিকতার মানুষগুলো চাচা, মামা, খালু, দুলাভাই, কাজিন; এমনকি দাদা-নানাও হতে পারে।

সন্তানদের নিরাপত্তার জন্য যদি নিজেকেও সতর্কতার চোখে দেখতে হয়, আমার মনে হয় সেটাই করা উচিত। কে কী মনে করবে, সেই চিন্তায় যেন আমরা আমাদের সন্তানদেরকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে না দিই।

❖ চাইল্ড বিহেভিয়ার অ্যাবিউজ

যখন আমি পড়তে বসি কিংবা কারও সাথে কথা বলি-ফোনে, স্কাইপে বা সামনা-সামনি-সর্বাবস্থায় আমার ছেলেটা খুব বেশি বিরক্ত করে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকে। স্কাইপ হলে

যার সাথে কথা বলি, তার দিকে তাকিয়ে বিচিত্র মুখভঙ্গি করে। তখন আমারও ইচ্ছে করে কষে একটা চড় লাগিয়ে দিই।

অসংখ্যবার তাকে বুঝিয়ে বলেছি; কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। বাধ্য হয়েই তার দিকে কড়া চোখে তাকাতে হয়। মাঝে মাঝে চেহারায় ফুটে ওঠে বিরক্তির ভাব। একদিন কথাপ্রসঙ্গে ওকে বললাম, আম্মু তোমার সাথে সময় কাটাতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি। সাথে সাথে জবাব দিল—না আম্মু, তুমি আমার চেয়ে পড়াশোনা করতে আর মানুষের সাথে কথা বলতে বেশি পছন্দ করো, আমার চেয়ে এসব তোমার কাছে বেশি প্রিয়, আমাকে তুমি সবচেয়ে কম ভালোবাসো।

এতটুকু ছেলের মুখে এমন অনুযোগ শুনে আমি একদম স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

আমার ছেলের স্কুলবন্ধুরা প্রতি সপ্তাহে একবার আমাদের বাসায় ইংরেজি শিখতে আসে। একদিন পড়া শেষ হওয়ার পর সবাই মিলে এত বেশি হইচই করছিল, আমি দুষ্টুমির ছলে তার গাল ধরে একটু টেনে দিয়েছিলাম। ও তখন কিছু বলল না। কিন্তু বন্ধুরা সবাই চলে যাওয়ার পর মুখ ভার করে বসে রইল। আমার সাথে কথা বলে না, খাওয়া নিয়ে মর্জি করতে থাকে। অনেক করে কারণ জিজ্ঞাসা করার পর বলল, 'তুমি আমাকে সবার সামনে

অপমান করেছ।'

আরেক বার আমি স্তব্ধ হলাম তার কথায়।

গত সাত বছর আমার ছেলের সমস্ত জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নের উত্তর আমি নির্ভুলভাবে দিতে চেষ্টা করেছি। কোনো কিছু না জানলে ঝটপট ইন্টারনেট থেকে দেখে নিয়ে জানিয়েছি। ধীরে ধীরে তার মনে ধারণা জন্মে গিয়েছিল-আমার আম্মু সব জানে। কয়েকদিন আগে বাইরে ঘুরতে গিয়ে একটা জিনিস জানতে চাইলে বললাম, এখন তো বলতে পারব না, বাসায় গিয়ে বলব।

চোখ বড় বড় করে তখন সে বিস্মিত কণ্ঠে বলেছিল, 'তুমি জানো না? তুমি সত্যি জানো না আম্মু?'

বুঝলাম, কী ভুল করেছি!

আমার ছেলের সমবয়সি একটা ছেলে আছে এক ভাবির। কাছাকাছি বাসা। তাই ভাবিটা প্রায়ই আসেন ছেলেকে নিয়ে। খুব ভাব আমাদের দুই বাচ্চার মধ্যে। একে অন্যের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। কিন্তু সেই ভাবি সারাক্ষণ তার ছেলেকে বলতে থাকেন-নাকীব তোমার চেয়ে এটাতে ভালো, ওটাতে ভালো ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই তুলনা ধীরে ধীরে তাদের বন্ধুত্বে দূরত্ব তৈরি করে দিচ্ছিল এবং ওই বাচ্চাটার মনে বন্ধুর প্রতি বিরাগ জন্ম দিচ্ছিল।

এ ধরনের ঘটনা আমাদের চারপাশে অহরহ ঘটছে এবং আমরা নিজেরাও প্রতিনিয়ত ঘটিয়ে চলেছি। অথচ আমাদের এই সমস্ত আচরণ বাচ্চাদের মনোজগতে কী ধরনের প্রভাব ফেলছে, তা মোটেই চিন্তা করে দেখছি না। বেশিরভাগ সময় বাচ্চারা এসব কথা প্রকাশ না করে মনের মধ্যে চেপে রেখে নানা ধরনের কষ্ট ও ধারণা তৈরি করে নেয়। আমাদের প্রতিটা কথা, প্রতিটা আচরণ কোনো না কোনো প্রভাব রেখে যায় বাচ্চাদের মনে। আমরা তাদের নিয়ে অনেক বড় বড় স্বপ্ন দেখি, কিন্তু আমাদের আচরণগুলোই বাধা হয়ে দাঁড়ায় সে স্বপ্ন পূরণের পথে।

বাবা-মায়েদের কখনোই এমন কোনো আচরণ করা উচিত নয়, যার ফলে বাচ্চাদের মনে এমন ধারণা জন্ম নেয়, তার চেয়ে অন্যকিছু বাবা-মায়ের কাছে বেশি প্রিয়। শিশুদেরকে কখনোই কারও সাথে তুলনা করা ঠিক নয়। প্রত্যেকটি শিশু আলাদা, তাই প্রত্যেককে মূল্যায়ন করতে হবে তার নিজস্ব গুণাবলি দ্বারা। শিশুদের সামনে নিজেদেরকে অবশ্যই আদর্শ মডেল হিসেবে পেশ করতে হবে: কিন্তু সবজান্তা, নির্ভুল, নিষ্পাপ হিসেবে তুলে ধরাটা সঠিক কোনো কাজ নয়। বাচ্চা ভুল করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কখনোই তাকে অন্যের সামনে বকাঝকা বা অপ্রস্তুত করা অনুচিত। নিজেদের ইচ্ছা-পছন্দকেও কখনো বাচ্চার ওপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়।

আসলে বাবা-মা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের আচরণগত ত্রুটির কারণে বাচ্চাদের ওপর কী পরিমাণ মন্দ প্রভাব পড়ে, তা লিখে বোঝানো যাবে না। তবে সবার উচিত ছোটবেলা থেকেই বাচ্চাদের মধ্যে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করা। কারণ এই চেতনা মানুষকে নেতিবাচক পরিবেশের মধ্যেও আশা ধরে রাখতে সহায়তা করে।

❖ চাইল্ড ইমোশনাল অ্যাবিউজ

আমার ছেলের সঙ্গে আমি নিয়মিত যে কাজগুলো করি, এর একটা হচ্ছে তার সঙ্গে তার মতো করে খেলা করা। কিছু নির্ধারিত সময়ে আমি নিয়মিত তার সঙ্গে খেলি। কখনো আমার আসতে দেরি হলে ও চিৎকার করে ডাকে, আম্মু, খেলতে আসবে না? আমিও তখন ছুটে যাই তার সঙ্গে খেলার জন্য। কোনোদিন যদি ব্যস্ততার কারণে না যাই, সে প্রচন্ড অভিমান করে।

একবার টানা প্রায় এক সপ্তাহ বিভিন্ন কারণে আমি তার ডাকে সাড়া দিতে পারিনি। তিন-চারদিন পর খেয়াল করলাম, ধীরে ধীরে ওর অভিমান কমছে এবং আমাকে ডাকা ছেড়ে দিচ্ছে। তিন বছরে যে অভ্যাসটা গড়ে উঠেছিল, মাত্র এক সপ্তাহে সেটা গতি হারিয়েছে। অভ্যাসটা আবার গড়তে অনেক দিন লেগেছিল। কিন্তু এখনো মাঝে মাঝে সে আমাকে ডাকতে ভুলে যায়। কোনো কারণে সঙ্গ দিতে না পারলে সে রকম অভিমানও করে না।

আমার ব্যালকনি থেকে আমাদের বাড়ির মেইন গেইট দেখা যায়। আগে সকালে যখন ছেলেকে তার বাবা স্কুলে নিয়ে যেতেন, আমি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকতাম। নিচে দাঁড়িয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে আমার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে তারপর সে বাবার হাত ধরে গুটিগুটি পায়ে গেট দিয়ে বের হয়ে যেত। একদিন ব্যস্ততার কারণে আমি ব্যালকনিতে দাঁড়াতে পারিনি। সেদিন স্কুল থেকে ফিরে অভিমান আর কষ্টের প্রচন্ডতায় সে কান্না করে দিয়েছিল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলেছিল, 'আমি বারবার ওপরে তাকিয়েছি, কিন্তু তুমি ছিলে না।'

শারীরিক অসুস্থতার কারণে একবার বেশ কয়েকদিন ব্যালকনিতে দাঁড়াতে পারিনি। এর ফলাফলও ছিল প্রথম ঘটনার মতোই। কিন্তু ইদানীং আমি ডাকলেই শুধু সে ওপরের দিকে তাকায়, আর না হয় তাকায় না। কোনোদিন না দাঁড়ালে আগের মতো অভিমান করে না।

শিশুরা যদি তাদের আবেগের যথাযথ মূল্য না পায়, তাহলে একটা সময় সে আবেগের প্রকাশ বন্ধ করে দেয়। আর নিজের আবেগকে প্রতিনিয়ত অবহেলিত হতে দেখার ফলে অন্যের আবেগকেও মূল্যায়ন করতে শিখতে পারে না। এটা একধরনের ইমোশনাল অ্যাবিউজ, যার কারণে শিশুদের মধ্যে নিজেদের আবেগকে প্রকাশ করা ও অন্যদের আবেগকে মূল্যায়ন করার ক্ষমতা বাধাগ্রস্ত হয়।

বাবা-মায়েদের একটা সমস্যা হলো, সন্তানদের ভালোর চিন্তায় বা ভালোবাসার কারণে নিজেদের পছন্দগুলো তারা সন্তানদের ওপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। অনেক বাবা-মা আছেন, যারা নিজেদের জীবনের অপূর্ণ স্বপ্নকে সন্তানদের মাধ্যমে পূরণ করতে চান। সন্তানদের ওপর চাপিয়ে দেন নিজেদের ব্যর্থতা এবং প্রত্যাশার ভার।

জীবনে সে কী হতে চায় বা কী পেতে চায়, তা বোঝার আগেই শিশুদের শুনতে হয়-তোমাকে ডাক্তার হতে হবে, ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে কিংবা হতে হবে বিজ্ঞানী। নিজের স্বপ্নকে আবেগের সাথে উপলব্ধি করার আগেই বাবা-মায়ের প্রত্যাশার বোঝা চেপে বসে তাদের কচি মন ও মানসিকতার ওপর। স্বপ্নের পাখিরা আবেগের ডানার অভাবে হারিয়ে ফেলে ওড়ার ক্ষমতা।

প্রতিযোগিতার হাওয়া বইছে চারদিকে—এক স্কুলের সঙ্গে অন্য স্কুলের প্রতিযোগিতা, এক বাবা-মায়ের প্রতিযোগিতা অন্য বাবা-মায়ের সঙ্গে; কোচিং সেন্টারের সঙ্গে কোচিং সেন্টারের প্রতিযোগিতা, এক শিক্ষকের প্রতিযোগিতা লেগে থাকে অন্য শিক্ষকের সাথে!

'নাইনটি পার্সেন্ট মার্কস পেতে হবে', 'নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস পেতে হবে'-এ ধরনের ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল আর এক্সপেক্টেটেশনের চাপে কোমলপ্রাণ শিশুগুলোর শৈশবের আবেগ কোথায় যেন হারিয়ে যায়। সেইসাথে হ্রাস পায় তাদের আবেগের প্রকাশ, অনুভব ও উপলব্ধির ক্ষমতা।**[১]

❖ শিশুদের শাস্তি দেওয়া

একদিন এক স্টুডেন্ট সারা ক্লাসে মন খারাপ করে বসে ছিলো। ক্লাস শেষে টিচার তাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে তোমার, এত মন খারাপ করে বসে আছো কেন?'

উত্তরে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, 'আমি দুষ্টুমি করেছিলাম বলে আম্মু বলেছেন আমাকে দুইদিন খেলতে যেতে দেবেন না।'

এরপর লম্বা ফিরিস্তি দিতে লাগলো, সে কত অল্প দুষ্টুমি করেছে আর আম্মু তাকে কত বড় শাস্তি দিয়েছেন! আকারে-ইঙ্গিতে বোঝাল, আম্মু তার সঙ্গে অন্যায় করলেন। ইচ্ছে করলেই তিনি তাকে মাফ করে দিতে পারতেন।

শিশুদের শাসন করা এবং শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করা পিতা-মাতার ওপর ফরজ। এতে কোনোপ্রকার অলসতা, দুর্বলতা ও ছাড় দেওয়া এবং অতি আদর করা শিশু নষ্ট হওয়া এবং ভবিষ্যৎ ধ্বংস হওয়ার কারণ। এটি পিতা-মাতাকেও অপরাধী বানিয়ে দেয়। শিশুদের শাসনের নিয়ম হচ্ছে, যথাসম্ভব পূর্ণ নম্রতা ও সহানুভূতির আচরণ করা। যাতে তাদের হৃদয়ে এ কথা খুব ভালোভাবে বসে যায় যে, পিতা-মাতা যা কিছু করছেন তা আমাদের কল্যাণেই করছেন। কথায় কথায় বকাঝকা করা, ধমক দেওয়া ও প্রহার করা তাদের মানসিকভাবে প্রভাবিত করে, যা অধিকাংশ সময় বিপরীত মানসিকতা তৈরি করে। যেমনিভাবে সীমাহীন আদর-স্নেহ শিশুর মাঝে জেদ তৈরি করে, তেমনিভাবে অতিরিক্ত কঠোরতা তাদের জেদি বানিয়ে ছাড়ে। কত শিশু মা-বাবা উভয়ের বা একজনের কঠোরতার কারণে নষ্ট হয়েছে তার হিসাব নেই।

বাচ্চারা দুষ্টুমি, ভুল, অন্যায় করবেই। তাই মাঝেমধ্যে শাসনের প্রয়োজনে বাচ্চাদের শাস্তি দিতে হবে। কারণ সবসময় যদি ক্ষমা করে দেওয়া হয়, তাহলে তাদের মনে ভুলের প্রতি সাবধানতা বা সতর্কতা তৈরি হয় না; বরং এ বিশ্বাস জন্মে যায়-সে যা-ই করবে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। যা তার ছোট ছোট ভুলগুলোকে বড় বড় ভুলের পথে টেনে নিয়ে যাবে।

তবে শাস্তি হিসেবে পছন্দের জিনিস বন্ধ করে দেওয়া উচিত নয়। কারণ এতে বাচ্চাদের মনে চাপ পড়ে। অন্যায়ের অনুশোচনার চেয়েও প্রিয় কিছু না পাওয়ার কষ্ট বেশি কাজ করে। বাবা-

মা তাকে বোঝে না, ভালোবাসে না ইত্যাদি ভাবনা দানা বাঁধতে থাকে তাদের মনের ভেতর। অনেক সময় এই ধরনের শাস্তি ইমোশনাল অ্যাবিউজের মধ্যেও পড়ে যায়।

তাই শাস্তি হিসেবে আমরা বাচ্চার পছন্দের জিনিস কখনোই বন্ধ করবো না। আমরা যা করতে পারি, তা হলো-শাস্তি হিসেবে ওর সবচেয়ে অপছন্দের কাজটি করানো।

আমার মতে, শাস্তি হতে হবে এমন, যা বাচ্চাদেরকে তাদের ভুল উপলব্ধি করতে সহায়তা করবে। ভবিষ্যতে যাতে এমন ভুল আর না হয়, সে ব্যাপারে সাবধানি করে তুলবে। একইসঙ্গে যারা শাস্তি দিচ্ছেন, তাদের প্রতিও মনে কোনো বিদ্বেষ জন্ম দেবে না। বড়রা তো আসলে মঙ্গলের জন্যই শাস্তি দেন। কিন্তু বাচ্চারা যদি এটা অনুভব করতে না পারে, তাহলে শাস্তি আপন লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। তাই শাসন এমন হওয়া উচিত, যা অভিভাবক এবং বাচ্চা উভয়ের জন্য ফলপ্রসূ হয়।**[২]

❖ শিশুদের মনোজগতে শাস্তির প্রভাব

কয়েকজন সহপাঠী মিলে একদিন অনলাইনে পুরো সপ্তাহের ক্লাসগুলো নিয়ে আলোচনা করছিলো। বন্ধুরা একত্র হয়ে গ্রুপওয়ার্ক করতে বসলে কথা কখনোই এক বিষয়ে স্থির থাকে না। একদিন তাদের আলোচনার এক ফাঁকে খাবার নিয়ে কথা উঠল। দুপুরে কে কী খেয়েছে, জানতে চাওয়া হলো। সেখানে উপস্থিত এক বোনের হাজবেন্ডের ডাল পছন্দ, তাই তাদের দুপুরের মেন্যুতে আবশ্যিকভাবে ডাল থাকে। এটা শুনে এক বন্ধু হাসতে হাসতে বলল, কেন যে ডালের কথা মনে করিয়ে দিলি! এখন আমার মাথায় ভেসে উঠবে ডাল-ঘুঁটনির কল্পনা, তারপর মনে পড়বে এটা দিয়ে আম্মু আমাকে কত পিটুনি যে দিয়েছেন!

ঘটনা কী, জানতে চাইলে ও জানায়, ছোটবেলায় দুষ্টুমি করলেই ওর আম্মু ওকে ডাল-ঘুঁটনি দিয়ে তাড়া করতেন। সেই থেকে ডাল আর ডাল-ঘুঁটনির প্রতি ওর মনে একধরনের বিরাগ জন্মে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে হাসির একটা মৃদু কলরোল বয়ে গেল। সেটা থামতেই একজন বলল, ছোটবেলায় চাচা আমাকে পড়াতেন। কোনো ভুল করলেই দুই আঙুলের মধ্যে পেন্সিল ঢুকিয়ে চাপ দিতেন। কখনো কখনো পেটের মধ্যে পেন্সিল দিয়ে মোচড় দিতেন। আরেকজন বলল, আমি দুষ্টুমি করলে আম্মু বাথরুমের লাইট বন্ধ করে আমাকে আটকে রাখতেন। আরেকজন জানাল, তার বাবা নাকি কিছু হলেই শুধু কান ধরে উঠবস করাতেন। উঠবসের সংখ্যা কখনোই পঞ্চাশের নিচে হতো না।

এক বোন তার পরিচিত আরেক বোনকে ফোন করেছিলেন শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য। তখন বাচ্চার চিৎকার শুনে জানতে চাইলেন, কী হয়েছে? জবাবে হাসতে হাসতে বলল, অতিরিক দুষ্টুমি করে, তাই বাথরুমপ আটকে রেখেছি আপু। কিছুক্ষণ থাকলে ঠান্ডা হয়ে যাবে।

আর উদাহরণে যাচ্ছি না। কারণ এমন বিচিত্র শাস্তির সাথে কমবেশি সবাই পরিচিত। সমস্যা হলো, আমরা বেশিরভাগই অভ্যাসের দাস। পাঁচ বছর মেরে কথা শোনানোর অভ্যাস করা হয়েছে যে বাচ্চাটিকে, না মেরে কথা শোনানোর জন্য কিছু সময় তো অবশ্যই দিতে হবে তাকে। তবে গঠনমূলক কাজে সময় ব্যয় করার ক্ষেত্রে আমাদের অনীহা একটু বেশি। আমাদের ভাবটা এমন থাকে, দুটো থাপ্পড়ে যেখানে কাজ হাসিল হয়ে যাচ্ছে, সেখানে দুই মিনিট বসে বোঝাতে যাব কোন দুঃখে?

কিন্তু এই ধরনের শাস্তিগুলো শিশুদের মনোজগতে কী বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, সেই ব্যাপারে আমরা অবগত নই। আবার যাদের মনোজগৎ সম্পর্কে ধারণা কম, তাদেরকে অবগত করতে গেলেও বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। শিশুদের মনোজগতে শাস্তির প্রভাব নিয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে এক বোন প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, শিশুরা বড় হলে এসব কথা মনে রাখে না। আমাদের সাথেও এমন হয়েছিল, এতে করে কি আমরা ডিপ্রেশনের রোগী হয়ে গেছি? মোটেই না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এটা ঠিক, শিশুরা বড় হলে এসব কথা মনে রাখে না কিংবা তাদের মনে থাকে না। কিন্তু অবচেতনে ঠিকই কটু কথাগুলো এবং শাস্তির ঘটনাগুলোর প্রভাব তাদের মধ্যে থেকে যায়। যার কারণে বড় হয়ে যখন তারা কাউকে এই ধরনের শাস্তি পেতে দেখে বা শোনে, নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা তাদের মনে চলে আসে। কিছুক্ষণের জন্য হলেও বুকের ভেতর বিষাদ কিংবা বেদনা ভর করে।

আবার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হয়তো কারও কারও কাছে ছোটবেলার সেসব স্মৃতি হাসির খোরাক বা বিনোদনে পরিণত হয় কিংবা তারা ব্যাপারগুলোকে যুক্তি দ্বারা ইতিবাচক করে নেয়। ভাবে, বাবা-মা তাকে তার ভালোর জন্যই মেরেছেন কিংবা ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন। কারণ শাস্তি পাওয়ার মতো কাজই সে করেছিল এবং বাবা-মায়ের শক্ত পদক্ষেপের বদলে নিজেকে শুধরে আজ এ পর্যন্ত আসতে পেরেছে। কিন্তু এই বোধটা কি তার ছোটবেলারও, নাকি শুধু বর্তমানের?

শিশুরা অন্যায় বা ভুল করবেই। কারণ তারা অবুঝ। তাই এমন কিছু হলে শিশুদের বুঝিয়ে বলতে হবে। সে কী ভুল করেছে, কেন এটা করা ঠিক নয়, এটা করার ফলে কী কী হয়েছে ইত্যাদি। অনেক সময় বুঝিয়ে বলার পরও শিশুরা একই কাজ বারবার করতে থাকে। এসব ক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত, আমাদের নিজেদের দ্বারাও অনেক সময় একই ভুলের পুনরাবৃত্তি হয়। আর সে তো শিশু! সুতরাং ধৈর্য ধরে বোঝানোর চেষ্টাটা জারি রাখতে হবে। তাছাড়া সুন্দর করে বুঝিয়ে বলতে পারলে বেশিরভাগ সময় শিশুরা মেনে চলার চেষ্টা করে।

বেড়ে ওঠার পরিবেশ থেকে শিশুরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তা তাদের সামাজিক দক্ষতা, অন্যের আবেগকে বুঝতে পারা এবং ইতিবাচক-নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হওয়াকে প্রভাবিত করে। অন্যায় বা ভুল করলে তাদের সাথে কেমন আচরণ করা হয়, সেটা দেখেই তারা অন্যের ভুল বা অন্যায়কে মূল্যায়ন করে। তাই শিশুদের ভুলগুলো বুঝিয়ে বলে তাদেরকে তা

থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করতে হবে। আর এভাবেই হবে তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণের পথে উত্তম সহযোগিতা। বিপরীতে কোনো বিষয়ে তাকে ধমক, শাস্তি বা বকা দিলে তার মনে নিজেকে ঘিরে নানারকম নেতিবাচক চিন্তা তৈরি হয়। 'পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় বাবা-মা'-এই বিশ্বাসেও সূক্ষ্ম চিড় ধরে যায়। সবসময় সে বাবা-মাকে পাশে পাবে কি পাবে না-এই ভরসা হয়ে ওঠে দোদুল্যমান।

একটা শিশু বড় হয়ে যেন একজন আদর্শ মানুষ হতে পারে, তার জন্য দরকার শুধু একটা জিনিস-সঠিক অভিভাবকত্ব। একমাত্র সঠিক অভিভাবকত্বই পারে একটি শিশুকে সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে, সুখী করতে ও সুন্দর-সুস্থ জীবন দিতে। কেননা শিশুদের মানসিক বিকাশ অনেকাংশেই নির্ভর করে পরিবারের সদস্যরা তাদের ভুল বা অন্যায়গুলো কীভাবে দেখছে এবং কীভাবে সেগুলো সংস্কারের চেষ্টা করছে, তার ওপর। শিশু ভুল করলে প্রয়োজনে অবশ্যই তাকে শাস্তি দিতে হবে; কিন্তু তা দিতে হবে সঠিক পদ্ধতিতে। ভুলে গেলে চলবে না, শিশুরা তাদের সাথে ঘটে যাওয়া প্রতিটা ঘটনা থেকে শিখতে থাকে এবং সংগ্রহ করতে থাকে চলার পথের পাথেয়। শিশুরা হচ্ছে আয়না, আয়নার বুকে সে জিনিসের প্রতিফলনই ঘটে, যা তার সামনে থাকে।**[৩]

❖ পিতামাতার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক মন্তব্যের উদাহরণ

বাচ্চাদের লালন-পালন করার সময়, তাদের মানুষ করার সময় বিভিন্ন পর্যায়ে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক আচরণগুলো ফুটে উঠে। বাচ্চাদের নির্দিষ্ট ধরনের আচরণ বা ক্রিয়া-কলাপের প্রতিক্রিয়া হিসেবে পিতামাতার ইতিবাচক মন্তব্য করা উচিত।

যেমন ধরুন, যদি আপনার ছেলে আপনাকে রাতের খাবার টেবিল গোছাতে সাহায্য করে তখন আপনি তাকে বললেন, 'তুমি যখন আমাকে সাহায্য করো, তখন আমার খুব ভালো লাগে।' এটা ইতিবাচক আচরণ।

মনে করুন, আপনার মেয়ে একটা সুন্দর জামা পরল তখন আপনি তাকে বললেন, 'জামাটা তোমাকে অনেক সুন্দর মানিয়েছে'। এটা ইতিবাচক আচরণ।

দ্রষ্টব্য: পিতামাতাদের ইতিবাচক মন্তব্য করা উচিত। তবে বাচ্চা যদি এ জাতীয় কাজ না করে তাহলে অবিরত সন্তানের প্রশংসা করা উচিত নয়। বাচ্চার ইতিবাচক কাজগুলোর জন্যই শুধু ইতিবাচক কথা বলতে হবে।

অন্যদিকে, ধরুন, আপনার ছেলেটি আপনাকে খাবার টেবিল গোছাতে সাহায্য করছে। হঠাৎ করে সে একটি গ্লাস ভেঙে ফেলল। আপনি তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন। বললেন, 'একটি কাজও ঠিকমতো করতে পারো না। তুমি একটা আনাড়ি'। পিতামাতা হিসেবে এটি আপনার একটি নেতিবাচক আচরণ।

আপনি আপনার বাচ্চার ব্যাপারে কাউকে এভাবে বলছেন, 'সে সবসময় দুষ্টুমি করে, আমার ঝামেলা বাড়ায়, রাজ্যের বদ'। অথবা বিরূপ কোনো মন্তব্য করেন— 'সে কঙ্কালের মতো চিকন, বানরের মতো বজ্জাত' ইত্যাদি ব্যাপারগুলোও আপবার নেতিবাচক আচরণ।**[৪]

❖ সরাসরি অভিযোগ করবেন না

সন্তানের সাথে পরামর্শ করুন। তাদের দিকে আঙুল তুলে সরাসরি দোষী সাব্যস্ত করবেন না। শিশুরা যেন তাদের নেতিবাচক কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন। শিশুরা কোনটা ভালো কোনটা মন্দ তা হয়তো বা বুঝতে পারে না, তাই তারা কোনো খারাপ কাজ করে ফেললে নম্রতার সাথে তাদেরকে নসিহা করুন। বুঝিয়ে বলুন, তারা কী করেছে এবং এর ফলাফল কী হতে পারে। তাদের অন্তরে নেতিবাচক কাজগুলোর প্রতি অনুশোচনাবোধ তৈরি করুন, যাতে করে তারা এমন কাজ করতে আর উৎসাহী না হয়। বাচ্চাদের অন্তর অনেক বেশি নরম হয় এবং তারা খুব সহজেই ভেঙে পড়তে পারে। তাই কখনো তাদেরকে জোরে জোরে চিৎকার করে শাসন করা অথবা সকলের সামনে তাদের ভুলগুলো দেখিয়ে দিয়ে লজ্জা দেবেন না। হিতে বিপরীত হতে পারে। তাদের ছোটোমনে ক্রোধ জন্ম নিতে পারে এবং আপনাদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য এ কাজগুলো আরও বেশি বেশি করে করতে পারে। তাদেরকে ইসলামিক আমল আকিদার ছোটো ছোটো গল্প পড়ে শোনান। সাহাবিদের জীবনকাহিনি পড়ে শোনান। তাদের নেতিবাচক কাজগুলো নিয়ে হা হুতাশ করা এবং তাদের সামনে অন্যদের কাছে বিলাপ করবেন না। ছোটোবেলা থেকেই বাচ্চারা অন্যের মনোযোগ পেতে চায়। তারা যখন দেখবে নেতিবাচক উপায় অবলম্বন করেও তারা অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারছে তখন কাজগুলো আরও বেশি করতে থাকবে। বরং তাদেরকে সাবধানে নসিহা করুন। বাচ্চাদেরকে কখনো অভিশাপ দেবেন না। তাদের জন্য এমন শাস্তির ব্যবস্থা করবেন না, যেটা তাদের শারীরিক সুস্থতার অবনতি ঘটায়। বাচ্চাদের গায়ে কখনো হাত তুলবেন না। তাদেরকে না দিলে যদি তারা না মানে তাহলে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করুন এবং নতুন নতুন উপায় বের করুন। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। বাচ্চাদের মন-মানসিকতা নিয়ে পড়াশোনা করুন।

উদাহরণ: আপনার সন্তানকে স্কুল থেকে আনতে যাওয়ার সময় শুনলেন তার বিরুদ্ধে শিক্ষকের নানা অভিযোগ। সে তার সহপাঠীদের টিফিন ফেলে দিয়েছে। আপনি সেখানেই সবার সামনে আপনার বাচ্চাকে বকাঝকা করে তার ভেতরে লজ্জা ঢুকিয়ে দেবেননা। বরং সে যখন একটু শান্ত হবে তখন আলাদাভাবে সে কী করেছে তা তাকে বুঝিয়ে বলুন। টিফিন ফেলে দেওয়ার কারণে তার সহপাঠী আজকে না খেয়ে ছিল, এই ব্যপারটা তার অন্তরে যেন দাগ কাটে এবং খাবার নষ্ট করার পরিণাম তাকে বুঝিয়ে দিন। সে যদি তার কৃতকর্মের ওপর অনুতপ্ত হয় তাহলে ভবিষ্যতে এমন কাজ আর করবে না।**[৫]]

❖ ফলাফলকে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করুন

আপনার সন্তানকে ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত করতে এবং এগুলো তার অভ্যাসে পরিণত করতে খারাপ কাজের পরিণাম তার কাছে তুলে ধরুন। এগুলো তার জীবনে কীরূপ প্রভাব ফেলবে তার আলোচনা করুন। যখন খারাপ কাজের পরিণাম তার কাছে নেতিবাচক হয়ে ধরা দেবে তখন এগুলোর প্রতি তার অনীহা সৃষ্টি হবে এবং নিজেকে সরিয়ে আনবে। এ ছাড়া সন্তানের খারাপ অভ্যাসগুলো থেকে তাকে সরাসরি ফিরিয়ে আনা যায় না। আপনি আজকে থেকেই তাকে এই হুকুম দিয়ে দিতে পারবেন না যে, 'তুমি পুরো খাবার শেষ না করে উঠতে পারবে না'। বরং আপনি যদি এর নেতিবাচক দিকটি বুঝিয়ে বলে এরপর তাকে এই অভ্যাস থেকে সরে আসতে বলেন, তাহলে এই নসিহা তার ওপর দারুণভাবে প্রভাব ফেলবে। তাই সন্তানের খারাপ অভ্যাসগুলো দূর করে ফেলার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে এর নেতিবাচক দিকগুলো তার কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরুন। তার ভেতরে এর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করুন।

উদাহরণ: আপনার ছেলে প্রায়ই গোসল করতে চায় না এবং ভীষণ কান্নাকাটি করে আপনাকে অতিষ্ঠ করে তোলে। আপনি সরাসরি তাকে বকাঝকা বা মারধর দিয়ে এই অভ্যাস থেকে সরিয়ে আনতে পারবেন না। তাহলে আপনার অনুপস্থিতিতে সে গোসল না করেই কাটিয়ে দেবে। বরং তাকে নিয়ে শান্ত হয়ে বসুন এবং গোসল না করে অপবিত্র ও অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকলে তার শরীরে কী কী জীবাণু বাসা বাঁধবে, এগুলো তার শরীরে কত রকম ভয়ানক অসুখ তৈরি করবে, তার চেহারা কেমন জংলিদের মতো হয়ে যাবে, খারাপ মানুষের মতো শরীর থেকে গন্ধ বের হবে-সেগুলো বিস্তারিত বর্ণনা করুন। খারাপ দিকগুলো তার কাছে এমনভাবে তুলে ধরুন, যেন কথাগুলো তার মনে দাগ কাটে এবং সে চিরতরে এই অভ্যাস থেকে নিজেকে সরিয়ে আনে।

উদাহরণ: আপনার মেয়ে সবসময়ের মতো আজকেও ক্লাসে শিক্ষকের দেওয়া কোনো পড়া বলতে পারেনি। শিক্ষকের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথে আপনি মেয়েকে একগাদা বকা শুনিয়ে দেবেন না। বরং তাকে এভাবে নসিহা করুন যে, সে যদি পড়াশোনা না করে তাহলে সে কিছুই শিখবে না। অন্যদিকে তার বান্ধবীরা অনেক কিছু শিখে বড় হয়ে ভালোভাবে জীবনটাকে সাজাবে। কিন্তু তাকে তখন কেউ ভালোবাসবে না, তার বান্ধবীরাও

তাকে দেখলে চিনতে পারবে না, সে একদম একা হয়ে পড়বে, নিজের পছন্দের জিনিসগুলোও সে কিনতে পারবে না, জীবনে সে ব্যর্থ হয়ে যাবে।**[৬]

❖ ছোটদের বুঝ ও ভুলগুলোকে তিনি প্রজ্ঞার সাথে ঠিক করে দিতেন

রাফে' বিন আমর আল গিফারি বলেন, আমি এবং আরেকটি বালক আনসারদের খেজুর গাছে পাথর ছুড়তাম। রাসূলের কাছে অভিযোগ করা হলো, এক বালক আমাদের খেজুর গাছে পাথর ছোড়ে। আমাকে ধরে রাসূলের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি আমাকে বললেন, 'হে বালক, খেজুর গাছে ঢিল ছুড়ো কেন?' আমি বললাম, খাওয়ার জন্য। রাসূল বললেন, 'আর ঢিল ছোড়ো না। নিচে যা পড়ে থাকে তা খেয়ে নিয়ো।' এরপর আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ, এর পেটকে আপনি পরিতৃপ্ত করুন।' [যায়িফ ইবনু মাজাহ : ২২৯৯; যয়িফ আত তিরমিযি : ১২৮৮; তবে আরও সহিহ হাদিস এর স্বপক্ষে আছে।]

যারঈ রহিমাহুল্লাহ বলেন, পড়ে থাকা খেজুর বা ফল সাধারণভাবেই যেহেতু খাওয়া বৈধ, ক্ষুধার সময় তো বলাই বাহুল্য। তবে লক্ষ করার বিষয় হলো, এখানে খাওয়ার বৈধতা দেওয়া হয়েছে; উঠিয়ে বহন করে নিয়ে যাওয়ার বৈধতা দেওয়া হয়নি। [হাশিয়া ইবনিল কাইয়িম : ৭/২০৩]

তিরমিযির বর্ণিত রিওয়ায়েতে এ বিষয়টি আরও স্পষ্টরূপে এসেছে। ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة

"যে ব্যক্তি বাগানে প্রবেশ করবে (ইচ্ছে হলে) সে খেয়ে নিক। তবে কোঁচড়ের মাঝে ভরে নেবে না।" [সহিহ সুনান আত তিরমিযি : ১৮৭]

আমর বিন শুধাইব তার বাবা থেকে, তাই বাবা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলের কাছে ঝুলন্ত খেজুর সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলো। তিনি বললেন:

من أصابه منه شيء من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه

"হাজতগ্রস্ত ব্যক্তি তা থেকে যদি কিছু খায় এবং কোঁচড়ে ভরে না নেয় তাহলে তাকে দোষারোপ কোরো না।" [সহিহ সুনান আত তিরমিযি : ১২৮৯]

আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসটিও এ রকম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

إذا أتيت على راع فناد ثلاث مرار ،فإذا أجابك والا فاشرب في غير أن تفسد ،وإذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاث مرات ،فإذا أجابك وإلا كل في ان لا تفسد
"যখন কোনো রাখালের কাছে আসবে তাকে তিন বার ডাকো। যদি সাড়া দেয় তো দিল। অন্যথায় কিছু নষ্ট না করে (দুধ দোহন করে) পান করে নাও। আর যদি বাগানের বেষ্টনীর কাছে আসো তাহলে বাগানের মালিককে তিন বার ডাকো। সাড়া দিলে তো দিল। অন্যথায় কিছু নষ্ট না করে খেয়ে নাও।" [সহিহ ইবনু মাজাহ : ১৮৭২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কত সুন্দরভাবে কার্যকর শারঈ পন্থায় ভুলগুলো শুধরে দিয়েছেন, অপরাধের মূল উৎপাটন করে দিয়েছেন! সন্তান প্রতিপালনকারী ভাইবোনদের অবশ্যই রাসূলের এই উসওয়াহ অনুকরণ করা কর্তব্য।

ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে দেখুন, কীভাবে তিনি ছোটদের ভুল শুধরে দিয়েছেন। কুরায়শের কিছু বালকের পাশ দিয়ে তিনি একবার যাচ্ছিলেন। তারা একটি পাখির ওপর নিশানাবাজি করছিল। পাখিটিকে রেখে তার ওপর নিশানা করছিল। আর পাখির মালিককে তারা (নিশানায়) ব্যর্থ হওয়া প্রতিটি তির (বিনিময়স্বরূপ) দিয়ে দিচ্ছিল। তারা যখন ইবনু উমরকে দেখল, ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বললেন, 'কে করেছে এটা? নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লানত করেছেন তার ওপর, যে এমন বস্তুর ওপর নিশানাবাজি করে যার প্রাণ আছে।' [মুসলিম, আয়দ অধ্যায় : ৩৬১৯; নাসাঈ : ৪৩৬৫]**[৭]

❖ নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করুন

সন্তান লালনপালন করা বাবা-মায়ের জন্য কঠিন পরীক্ষা। এই সন্তান-সন্ততির মাধ্যমেই আপনার জীবনে অনেক পরীক্ষা আসবে। বিভিন্ন চড়াই-উতরাইয়ের মাঝে নিজেকে দৃঢ় রাখুন এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। কখনো রেগে যাবেন না। এটা অনেক কঠিন তপস্যা। তবে আপনার প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিই এই রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। রেগে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারালে আপনি সন্তানের ওপর জুলুম করে বসতে পারেন। সন্তানের জন্য আল্লার কাছে দুআ করুন এবং চেষ্টা করে যান। হতাশ হয়ে রেগে গিয়ে হুঁশ হারিয়ে ফেলবেন না। হিতে বিপরীত হতে পারে। মনে রাখবেন, আপনারাই সন্তানের শেষ আশ্রয়স্থল। আপনাদের আচরণে ভয় পেয়ে সন্তান দূরে সরে গেলে তারা নিজেদের জীবনকে বিপদের দিকে ঠেলে দিতে পারে। রেগে গিয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি করে কথা বলার চেয়ে ঠান্ডা মাথায় এবং শান্ত গলায় তাদের নসিহা করুন। এটা কার্যকরী ফলাফল বয়ে আনবে। রাগ আসলে নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করুন এবং আল্লাহর কাছে পানাহ চান। সন্তানদেরকে তখন সাথে সাথে নসিহা করতে যাবেন না। নিজেদেরকে একটু দূরে সরিয়ে রাখুন এবং শান্ত হয়ে নিন। মনে রাখবেন, সন্তান-সন্ততি আপনাদের এই

দুনিয়াবি জীবনে এক কঠিন পরীক্ষার পাত্র। আপনাদের একটিমাত্র নসিহা তাদেরকে আজীবনের জন্য পরিবর্তন করে দেবে—এমনটা সবসময়ে নাও হতে পারে। তাই বারবার তাদেরকে বোঝাতে হবে, তারা বুঝতে চেষ্টা করবে এবং একটা সময় আয়ত্ত করে ফেলবে। ব্যর্থ হলেও বারবার চেষ্টা করে যেতে হবে। যদি তারপরেও আপনারা সফল না হন তার মানে এই নয় যে, আপনারা ব্যর্থ। বরং ভিন্নভাবে নতুন আঙ্গিকে চেষ্টা করে যেতে হবে। ধৈর্য হারাবেন না এবং রেগে যাবেন না।

উদাহরণ: আপনি আপনার ছেলেকে নিয়ে পড়তে বসালেন কিন্তু আপনার ছেলে কোনোভাবেই আপনার কাছে পড়তে চাচ্ছে না। সে বারবার বলছে, 'তোমার কাছে পড়তে ভালো লাগে না, আমি বাবার কাছে পড়ব'। আপনি সারা দিন সন্তানের দেখাশোনা করেন, তার জন্য খাবার তৈরি করেন কিন্তু দিনশেষে সে যখন বলে আপনাকে তার ভালো লাগে না এবং বাবাকে সে বেশি পছন্দ করে তখন গাভাবিকভাবেই আপনার রাগ হতে পারে এবং আপনি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সন্তানকে বকাঝকা করতে পারেন। কিন্তু এরকম পরিস্থিতিতে সাথে সাথে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করুন। আপনার সন্তান হয়তো বা আপনার সামনে এ কথা বলছে কিন্তু

বাবার কাছে আবার আপনার প্রশংসা করছে। আপনি তাকে কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে আসুন, দেখবেন আপনার জন্য কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে যাবে। তখন কিন্তু সে বাবাকে খুঁজবে না।

সন্তানদের ছোটো বড় যেকোনো ব্যাপারে কখনো রাগ করবেন না। বরং ধৈর্যের সাথে এবং আল্লাহর ওপর আস্থা রেখে তাদেরকে মানুষ করে যান।**[৮]

❖ শিশুদের তিরস্কার ও ধমক দেওয়া থেকে তিনি দূরে থাকতেন

বেশি বেশি তিরস্কার করা পরে লজ্জার কারণ হয়। ধমক বা সংশোধনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা শিশুকে দুষ্ট কাজে জড়িয়ে পড়তে আরও প্ররোচিত করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের অতিরঞ্জন থেকে সযত্নে দূরে থাকতেন। পরিমিত ও নিয়ন্ত্রিত শাসনের ফলে শিশুর হৃদয়ে লজ্জা ও অনুতাপের অনুভূতি জাগরূক হয়। সতর্কতা ও সচকিতের মেজায দৃঢ় হয়। আর উন্নত চরিত্রগুলোর মৌলিক সম্পর্ক এসব গুণের সাথেই। এসব গুণের পরিপূর্ণ মাত্রা আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাঝে বিদ্যমান ছিল। তিনি বেড়ে উঠেছিলেন রাসূলের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করেছি দশ বছর। আল্লাহর শপথ, তিনি কখনো 'উফ' শব্দটি উচ্চারণ করেননি। এবং কখনো বলেননি, 'এটা কেন করেছ, এটা কেন করোনি?' [বুখারি, আদব অধ্যায়; মুসলিম, ফাযায়েল অধ্যায়: ৪২৬৯]

আরেক বর্ণনায় আছে, এমন কখনো হয়নি যে, তিনি আমাকে কোনো আদেশ করেছেন আর আমি তা নষ্ট করেছি; ফলে তিনি তিরস্কার করেছেন। যদি তাঁর ঘরের কেউ আমাকে তিরস্কার করত তিনি বলতেন, 'ওকে ছেড়ে দাও। যদি এমনটি ঘটিত হওয়া নির্ধারণ হয়ে থাকে বা ফয়সালা হয়ে থাকে তবে তা হবেই।' [মুসনাদু আহমাদ : ১২৯৩৮]

আমাদের কোনো একজন ভাই অভিযোগ খাড়া করে বলেছেন, আমরা যদি আমাদের সন্তানদের সাথে এরূপ ব্যবহার করি তবে তারা দুঃসাহসী হয়ে যাবে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের আওতার বাইরে চলে যাবে! আমি বলব, তাহলে আনাস কেন সীমা লঙ্ঘন করলেন না? ইবনু আব্বাস কেন দুঃসাহসী হলেন না? যায়েদ বিন হারেসা এবং তার ছেলে উসামা বিন যায়েদ, জা'ফর তাইয়ার এবং আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমের সন্তানেরা রাসূলের নরম ও কোমল ব্যবহার পেয়ে কীভাবে মানব-জাহানের বরিত ইমাম ও অনুকরণীয় হয়ে উঠলেন? কেন এরা সবাই বা এদের একজনও সীমালঙ্ঘনকারী হলেন না?

হ্যাঁ, যাদের কাছে রাসূলের এই পন্থ্য ভালো লাগে না বা যারা অন্য পন্থাকে এর চেয়ে ভালো মনে করে অথবা এতে সংযোজন-বিয়োজনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, তাদের হাতে যদি

আনাস বা ইবনু আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর প্রতিপালনের দায়িত্ব সোপর্দ করা হতো তাহলে অবশ্যই তারা ব্যর্থ হতো।

কিন্তু অভিযোগকারী সে ভাই এখন বলবে, না না, আমরা এমনটি বলতে চাইনি। নিঃসন্দেহে রাসূলের পদ্ধতিই সর্বোত্তম পদ্ধতি। তবে... তবে... বুঝেনই তো আজকের ছেলেরা পাল্টে গেছে। আমি বলব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উচ্ছৃঙ্খল ছেলেদের সাথেও দুর্ব্যবহার করেননি। রাসূলের কাছে ব্যভিচারের অনুমতি চাইতে আসা যুবকের সাথেও তিনি নম্র ও প্রজ্ঞাপূর্ণ আচরণ করেছেন। তার হাত ধরে নিয়ে গেছেন তাওবার পথে। দীক্ষিত করেছেন মুক্তির মন্ত্রে। অন্যের গাছে পাথর মেরে খেজুর পেড়ে খাওয়া দুষ্ট ছেলেদের সাথেও তিনি সদাচরণ করেছেন। এমনকি ইহুদি বালকের প্রতি তাঁর মমতার আকর্ষণ এতটা ছিল যে, মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তেও তাকে ইসলামের কালিমা পড়ার তালকিন করেছেন। আর বালকটিও কালিমা পড়ে জান্নাতবাসী হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক পাপী-তাপী, মদ্যপের সাথে মুআমালা করেছেন এবং তারা সবাই তাঁর পরশে সঠিক পথ পেয়ে গিয়েছে। তারা সাক্ষ্য দিয়েছে, রাসূলের চেয়ে উত্তম ও নম্র শিক্ষক ইতিপূর্বে তারা কখনো দেখেনি। প্রত্যেকের সাথেই তিনি নম্র আচরণ করেছেন আর সবার ক্ষেত্রেই তাঁর এই কোমল আচরণের ইতিবাচক ফল প্রকাশ পেয়েছে। তবে আমাদের সাথে তাঁর মোটাদাগের ফারাক হলো, আমর সবকিছুতেই দ্রুত ফলাফল কামনা করি। অথচ তাঁর মন্ত্র ছিল,

'তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধরো।' 'তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করো।'

শিশুর সঠিক তরবিয়ত ও প্রতিপালনের জন্য আবশ্যক হলো শুরু থেকেই তার সাথে বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়িমুক্ত আচরণ করা। পরে শুধরে নেব বলে কেনো কিছুকে বিলম্বিত না করা। অন্যথায় পরে আর সুযোগ হবে না।

এ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের প্রতি ইমাম গাযালি রহিমাহুল্লাহর মূল্যবান একটি নাসিহাহ আছে। তিনি বলেন, ‘সব সময় শিশুর সাথে ধমকের সুরে কথা বোলো না। অন্যথায় সে তিরস্কার শুনতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। কথার গুরুত্ব তার মন থেকে পড়ে যাবে। সুতরাং বাবা সন্তানের সাথে গাম্ভীর্য নিয়ে কথা বলবে আর মা সন্তানকে বাবার ভয় দেখাবে।’ [ইহইয়া উলুমুদ্দিন]**[৯]

❖ শাসনের প্রয়োজনে শাস্তি

শাস্তি প্রদানের প্রথম ধাপ হচ্ছে, ঘরে ছড়ি কিংবা চাবুক ঝুলিয়ে রাখা। এতে সাধারণত শিশুদের শাসন হয়ে যায়। সুতরাং চাবুক দেখালে শিশু নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। অতএব, ঘরে ছড়ি কিংবা চাবুক রাখা উচিত। রাসুল ﷺ এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, রাসুল ﷺ ঘরে চাবুক লটকানোর নির্দেশ দিয়েছেন। [আল-আদাবুল মুফরাদ: ১২৬৫]
অন্য বর্ণনায় এই শব্দে এসেছে-সবুক এমন স্থানে ঝুলাও যে, সর্বদা ঘরের লোকদের দৃষ্টিগোচর হয়; এটি তাদের শিষ্টাচার শিক্ষা দেবে। [মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: ৯/৩১৮: আল-মুজামুল আওসাত: ৩/২১৮, হাদিস: ৪৩৮২। শেষ বাক্যটি আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেননি; তাবারানি করেছেন।]

রসূল ﷺ হজরত মুআজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দশটি নসিহত করেছেন। তন্মধ্যে এ-ও একটি ছিল- নিজের পরিবারের লোকদের শিষ্টাচার শেখানোর জন্য তাদের ওপর চাবুক ওঠাবে (অর্থাৎ চাবুক তাদের সামনে রাখবে)। এই হাদিসে এসেছে যে, আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে তাদের মাঝে ভয় সৃষ্টি করো। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৩৮]

এ ধরনের কথা হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকেও বর্ণিত আছে। [আল-মুজামুল আওসাত, ১/৫০৬, হাদিস: ১৮৬৯: আল-মুজামুস সাগির, হাদিস: ১১৪]

এসব হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, ঘরে চাবুক বা ছড়ি রাখা আবশ্যক, যা দেখে শিশুরা ভয় পাবে এবং নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পাবে।**[১০]

❖ শিশুকে যখন তিনি শাস্তি দিতেন কোমল ও আদুরে ভঙ্গিমায় তা দিতেন

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে কখনো হাত দিয়ে আঘাত করেননি। তবে কখনো হাল্কা কান মলে দিয়ে শাস্তি দিয়েছেন।

নু'মান বিন বশির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তায়েফ থেকে রাসূলের জন্য একবার কিছু আঙুর হাদিয়া এল। আমাকে ডেকে তিনি বললেন, 'এই থোকাটি নাও এবং তোমার মায়ের কাছে পৌঁছে দাও।' আমি মায়ের কাছে যাওয়ার আগেই সেটা খেয়ে ফেললাম। কয়েক দিন পর রাসূল আমাকে বললেন, 'আঙুরের থোকার কী খবর? তোমার মায়ের কাছে দিয়েছিলে?' আমি বললাম, না। তিনি আমাকে বললেন, 'ওহে গুদার (দুষ্ট প্রতারক)!' [মিসবাহুয যুজাজাহ : ৪/৩৫]

আবদুল্লাহ বিন বুসর আলমাযিনি বলেন, আমার আম্মা আঙুরের একটি থোকা দিয়ে রাসূলের কাছে পাঠালেন। তাঁর কাছে পৌঁছানোর আগেই আমি তা খেয়ে ফেললাম। যখন তাঁর কাছে গেলাম তিনি আমার কান ধরে বললেন, 'ওহে গুদার!' [মুসনাদুশ শামিয়্যিন লি আবিল কাসিম আত তাবরানি : ২/৩৫৫]

কেউ কেউ বলেন, বালক যদি আঙুরের প্রতি আকর্ষিত হয় এবং তা খেয়ে ফেলে এতে কোনো সমস্যা নেই। হাদিসের সাধারণ পাঠে এটাই বুঝে আসে যে, সে এর প্রতি আকর্ষিত হয়েছিল এবং সেটা খেয়ে ফেলেছিল। এতৎসত্ত্বেও কি এটা ধারণা করা যায় যে, রাসূল তাকে আমানত ও খিয়ানতের সবক না শিখিয়ে এমনিতেই ছেড়ে দেবেন! আসলে এখানে আমানতের চেয়ে বড় ব্যাপার ছিল বালকের চাহিদা পূরণ। সম্ভবত অনেকের কাছে এটা অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। তবে ভেবে দেখুন, রাসূল কত আদর করে নরম সুরে তাকে 'গুদার' (প্রতারক) নামে ডেকে ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিয়েছেন! অর্থাৎ যে কাজটি তুমি করেছ সেটা উচিত হয়নি। এ রকম করা প্রতারণার শামিল। এমনটি আর কোরো না।

আর এখানে ব্যাপারটি অত গুরুতর নয়। যদি গুরুতর হতো তাহলে রাসূল কী করতেন? হ্যাঁ, তিনি সে রকম কিছু করতেন যেমনটি করেছিলেন হাসানের সাথে, যখন তিনি সাদাকাহর একটি খেজুর মুখে দিয়েছিলেন। রাসূল তার মুখ থেকে খেজুরটি বের করেছিলেন এবং বলেছিলেন, 'কাখ, কাখ'। ফেলে দাও, ফেলে। সুতরাং ভালোভাবে বুঝে নিন।**[১১]

❖ শিশুদের প্রহার করার উপকারিতা

ছড়ি দেখানো বা কানমলার দ্বারা কাজ না হলে শেষ ধাপে প্রহার করা যাবে। কিন্তু এরও কিছু নিয়মনীতি আছে, যা মেনেই প্রহার করা বৈধ। এমন নয় যে, নিজের বলে যেভাবে খুশি এবং যখন খুশি প্রহার করবে। সন্তান আল্লাহ তাআলার আমানত; আমানতের হেফাজত করা আবশ্যক। সুতরাং এ ব্যাপারে রাসুল ﷺ যে সকল দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন এবং রাসুল ﷺ -এর শিক্ষার আলোকে উলামায়ে কেরাম যেসব উপদেশ উদ্ভাবন করেছেন তা মেনে চলা জরুরি।

তিনি কখনো কোনো বাচ্চা বা শিশুকে প্রহার করেননি, তবে প্রয়োজনে প্রহারের নীতি জানিয়ে দিয়েছেন

আবু উমামা বাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একবার দুটি বালককে আনা হলো। একজনকে তিনি আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে অর্পণ করলেন এবং বললেন:

لا تضربه فاني نهيت عن ضرب أهل الصلاة ،وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا
“একে প্রহার করবে না। কোনো সালাত আদায়কারীকে প্রহার করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আর আমি দেখছি, আসার পর থেকে সে সালাত পড়ছে।” [সহিহ আল আদাবুল মুফরাদ দিল আলবানি: ১২১]

ইসলামে সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে তাকে প্রহার করতে হলে সেটার উদ্দেশ্য থাকে সংশোধন এবং শিক্ষাদান। প্রতিশোধ গ্রহণ বা রাগ মেটানো নয়। সুতরাং শিশুকে শাস্তি দেওয়ার আগে তার স্বভাব ও মনোভাব বোঝা কর্তব্য। প্রথমে তাকে নিজের কৃত ভুলটি বুঝিয়ে দিতে হবে। এতে যদি সে সংশোধন করে নেয় তাহলে তাকে অবশ্যই মাফ করে দিতে হবে।**[১২]

❖ প্রহারের নীতিমালা

এক. দশ বছরের চেয়ে কমবয়সী কাউকে প্রহার করা যাবে না। সালাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিধানের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা ইসলাম জারি করেছে। তাহলে অন্যান্য ব্যাপারে বলাই বাহুল্য। সুতরাং দশ বছর বয়সে পা দেওয়ার আগে শিশুকে প্রহার তারা উচিত নয়। তবে এতটুকু করা যেতে পারে, সালাতের জন্য যে পরিমাণ প্রহার করা হবে তার চেয়ে কম অর্থাৎ তিনটি আঘাত না করে একটি আঘাত করবে। কারণ, একেবারে ছেড়ে দিলে সে অবাধ স্বাধীনতা পেয়ে যাবে যা তার জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

দুই. যতটা কম প্রহার করা যায়। খাবারের মাঝে লবণ যেমন, শাসনের ক্ষেত্রে প্রহারও তেমন হওয়া বাঞ্ছনীয়। লবণের পরিমাণ বেশি হলে খাবার যেমন বিস্বাদ হয়ে যায়, ঠিক প্রহারের আধিক্য তার অন্তর থেকে ভয়-ডর ঝেড়ে ফেলে দেয়। ফলে বখে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لا يوجد لدي فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله

“আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত হদ ছাড়া দশটার বেশি চাবুক (বেতের আঘাত। করা যাবে না।" [বুখারি, হুদুদ অধ্যায় : ৬৩৪২, তিরমিযি, হুদুদ অধ্যায়: ১৩৮৩]

এখানে বোঝা দরকার, প্রাপ্তবয়স্কের ক্ষেত্রে হদ ছাড়া দশের বেশি চাবুক মারতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং এখনো যে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তার ব্যাপারে আপনার কী ধারণা! অবশ্যই তাকে দশটাও আঘাত করা যাবে না। উমর বিন আব্দুল আযিয রহিমাহুল্লাহ মুসলিমদের বিভিন্ন অঞ্চলে ফরমান লিখে পাঠান যে, (কোরআন শিক্ষাদানকারী) শিক্ষক একসাথে তিনটার বেশি আঘাত করতে পারবে না। তিনটি আঘাতই শিশুকে ভয় দেখানোর জন্য যথেষ্ট। [কিতাবুল ইয়াল লি ইবনু আবিদ্দুনিয়া: ১/৫৩১]

আর হ্যাঁ, প্রহারকে এখানে আমরা বলব 'শিষ্টতা', শাস্তি নয়। অর্থাৎ নিছক শাস্তি হিসেবে আমরা প্রহার করব না; বরং প্রহারের মাঝে যখন শিশুর সংশোধন নিহিত দেখতে পাব তখনই কেবল শিষ্টতা শেখাতে প্রহার করব।

কাযি শুরাইহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'কোরআন শেখানোর ক্ষেত্রে শিশুকে তিনটির বেশি আঘাত করা যাবে না। কোরআনকে হৃদয়ঙ্গম করাতে জিবরাইল আলাইহিস সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিন বার চাপ দিয়েছিলেন।'

তিন, তাফসির-বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরাম বলেন, প্রহারের ক্ষেত্রে লক্ষ রাখবে, বেতের আঘাত যেন বেশির চেয়ে বেশি চামড়া পর্যন্ত পৌঁছায়। গোশত পর্যন্ত যেন কেনোভাবেই গিয়ে না ঠেকে। যে আঘাত গোশতে পৌঁছুবে, চামড়া ফাটিয়ে দেবে তা হবে কোরআনের বিধানের লঙ্ঘন। কেননা, কোরআনের এই শব্দের (فاجلدوا) উদ্দেশ্য হলো মানুষের শরীরের চামড়ার বহিরাংশ। (অর্থাৎ, কৃত অপরাধের দরুন অবিবাহিত ব্যভিচারীর চামড়ায় এক শ'টি চাবুক মারা হবে।) [মাহাসিনুত তাবিল লিল কাসিমি: ২৪৯]

প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা (একশ) ধর্তব্য।

চার, চাবুক (বেত) মোটা হওয়া যাবে না। সেখানে কোনো গিট থাকতে পারবে না। এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

যায়দ বিন আসলাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইটি ওয়া সাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি দেয়।
রাসূল তার জন্য একটি বেত আনতে বলেন। একটি ভাঙা বেত আনা হলো। তিনি বললেন, 'এটা ছাড়া?' আরেকটি নতুন বেত আনা হলো যেটি তখনো ছাড়ানো হয়নি। রাসূল বললেন, 'অন্যটা?' আরেকটি বেত নিয়ে আসা হলো যা মসৃণ করা ছিল। রাসূল সেটি দিয়ে আঘাত করতে আদেশ দিলেন। তাকে বেত্রাঘাত করা হলো। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:

أيها الناس إقد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله ،من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله
"হে লোকসকল, এখন সময় হয়েছে আল্লাহ তাআলার সীমানা থেকে নিবৃত্ত হওয়ার। যে এসব নোংরামিতে লিপ্ত হবে সে যেন তা গোপন রাখে। আর যে আমাদেরকে তার খাতা দেখিয়ে দেবে তার ওপর আল্লাহ তাআলার কিতাব কায়েম হবে (অর্থাৎ হদ কায়েম হবে)।"
[মুয়াত্তা মালিক, হুদুদ অধ্যায় : ২১৯৯]

পাঁচ, প্রহারকারী প্রহারের জন্য তার হাত বেশি ওপরে উঠাবে না।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক প্রহারকারীকে বলেন, 'তোমার বগল উঁচু কোরো না।' [আত তামহিদ লি ইবনু আব্দিল বার : ৫/৩৩৪]

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আঘাতটা যেন সীমাতিরিক্ত প্রচণ্ড না হয়।**[১৩]

❖ জীবন কখনো পশ্চাৎমুখী নয়

বাচ্চাদের সাথে কথা বলতে গেলে আমরা অনেক অদ্ভুত আর মজাদার সব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই। একইভাবে বাচ্চাদের মায়েদের সাথে কথা বলতে গেলেও বিচিত্র, বিরক্তিকর ও দুঃখজনক অনেক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে।

প্রথমেই বাচ্চাদের মায়েদের মনে রাখতে হবে, প্রতিটি শিশু এক অমিয় সম্ভাবনার আলো নিয়ে পৃথিবীতে আসে। আপনার শিশুও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু এই সম্ভাবনার বিকাশ নির্ভর করে আপনি কীভাবে তাকে গড়ে তুলছেন, তার ওপর।

শিশুর সম্ভাবনা বিকাশের জন্য প্রয়োজন প্রচুর সহমর্মিতাময় আবেগ। শিশুদের বেড়ে ওঠার পরিবেশে যদি ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও সহমর্মিতা থাকে, তাহলে তারা আত্মবিশ্বাসী, মহৎ ও উদার হয়ে বড় হতে পারে। আর যদি চারপাশটা নেতিবাচকতায় ঠাসা হয়, তাহলে তাদের চরিত্রেও সেটার প্রতিফলন ঘটে।

এই যেমন, আমরা এমন অনেক মায়েদের শুনেছি তাদের বিবাহিত জীবনের দুঃখভরা ইতিহাস —শ্বশুরবাড়ির সবার থেকে পাওয়া কমবেশি কষ্টের ঘটনা। যেখানে তাদের স্বামীও নাকি তেমন করে সাপোর্ট দেননি কখনো। কথাপ্রসঙ্গে তারা এও বলেন, আমাকে যে কষ্ট তারা দিয়েছে, তার কিছুই আমি ভুলিনি; ভুলবও না কখনো। আমার সন্তানরা বড় হয়ে এসবের প্রতিশোধ নেবে।

হাসতে হাসতে যদি বলা হয়, 'আপনি তো নায়কোচিত ডায়ালগ দিচ্ছেন!'

খুব ব্যথিত গলায় তখন তারা বলেন, 'আমার জায়গায় আপনি থাকলে এভাবে বলতে পারতেন না।'

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, 'শিশুরা হলো আয়নার প্রতিচ্ছবি'!

এই যে আজ আমি আমার বাচ্চাকে অন্যের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া শেখাচ্ছি, উলটো কথা শোনাচ্ছি, কাল যে সেই বাচ্চা তার কাছে অন্যায় মনে হওয়া কোনো আচরণের জন্য আমার

ওপরই প্রতিশোধ নিতে চাইবে না, এর নিশ্চয়তা কে দেবে? এই প্রতিশোধ নেওয়ার শিক্ষাটা তো আমারই দেওয়া!

'একজন ধনী ব্যবসায়ী আছেন, দেশে-বিদেশে মিলিয়ে টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ির কোনো অভাব নেই। তার বড় ছেলের বয়স ১৩ বছর। পড়াশোনার প্রতি ভীষণ ঝোঁক, রেজাল্টও অনেক ভালো। কিন্তু তিনি ঠিক করেছেন, সেকেন্ডারির পর ছেলেকে আর পড়াবেন না। কারণ তার কথা হলো-ব্যবসা দেখতে হবে ছেলেকে, শুধু শুধু পড়াশোনা করে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই!

আমাদের চারপাশে এমন বাবা-মায়ের অভাব নেই, যারা সন্তানদের নিজেদের অপূর্ণ স্বপ্ন পূরণের মাধ্যম মনে করেন। তারা একবারও ভেবে দেখেন না, সন্তান কী চায়, জীবনকে ঘিরে সন্তানের মনের স্বপ্ন কী? আমাদের মাধ্যমে সন্তানরা দুনিয়ায় এসেছে, তাই তাদেরকে আমরা নিজেদের স্বপ্ন পূরণের মাধ্যম বানিয়ে ফেলি!

কিন্তু আমাদের কি এই অধিকার আছে?

আমি মনে করি, নিজেদের স্বপ্নের জন্য সন্তানদের স্বপ্নকে নষ্ট করার কোনো অধিকার বাবা-মায়েদের নেই; থাকা উচিতও নয়।

আমরা যেন ভুলে না যাই, সন্তানরা আমাদের সম্পত্তি নয়, আমাদের স্বপ্ন পূরণের কোনো মাধ্যমও নয় তারা; বরং সন্তানরা আমাদের কাছে আল্লাহর দেওয়া আমানত। তাই তাদেরকে এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত, যাতে আমানতের খিয়ানত না হয়। তারা যেন আমাদের জন্য হয়ে ওঠে সাদাকায়ে জারিয়া।**[১৪]

❖ আয়নার প্রতিচ্ছবি

ব্যক্তিগতভাবে আমরা নিজেরা যেমনই হই না কেন, সবাই চাই আমাদের সন্তানেরা যেন খুব ভালো মানুষ হয়। আমরা বাবা-মায়েরা বুঝতে পারি বা না পারি, সন্তানরা কিন্তু সারাক্ষণই আমাদের অবলোকন করে, আমাদের দেখে শিখতে থাকে এবং আয়নার প্রতিচ্ছবির মতো হুবহু তা মাঝে মাঝে অভিনয় করে দেখায়। বাচ্চারা আমাদের প্রতিটা জিনিস লক্ষ করে। অর্থাৎ আমাদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ থেকে শুরু করে আমরা কীভাবে মানসিক চাপ মোকাবেলা করি, অন্যের বিপদে কীভাবে এগিয়ে যাই, সাফল্য-ব্যর্থতাকে কীভাবে গ্রহণ করি ইত্যাদি সবকিছু। এজন্য আমার মনে হয়, নিজেরা ভালো মনের এবং সুন্দর চরিত্রের না হয়ে আলোকিত সন্তান আশা করাটা একরকম অন্যায় কাজ। কারণ আমি আমার সন্তানটিকে দেখছি, কীভাবে সে আমার ভালো এবং মন্দ দুটোকেই ধীরে ধীরে ধারণ করে বেড়ে উঠছে।

উদাহরণ: আপনি সবসময় চেষ্টা করেন, আপনার কথা বা কাজের মাধ্যমে কেউ যেন সামান্য পরিমাণ কষ্ট বা আঘাত না পায়। আবার কেউ যদি আপনাকে কষ্ট দেয় বা আঘাত করে হতে পারে সেটা সামান্য একটা শব্দ, কিন্তু আপনি তা কিছুতেই ভুলতে পারেন না। যতটা সম্ভব তার কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে ফেলেন বা তাকে এড়িয়ে চলেন। এখন আপনার ছেলেটিকেও আজকাল এমন করতে দেখছেন। চার মাস আগে ক্লাসের একজন তাকে ধাক্কা দিয়েছিল বলে, এখনো সে সেই কথা মনে রেখে তাকে এড়িয়ে চলছে।

আপনার এই রকম খারাপ স্বভাবগুলো আপনি ওকে শেখাননি; বরং ওকে এসব থেয়ে মুক্ত রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আপনাকপ অবলোকন করে সে ঠিকই নিজে ভেতর সব ধারণ করে চলেছে।

সবকিছু মিলিয়ে আপনার ভালো এবং খারাপ দুটোই বাচ্চা অবলোকন করছে এবং নিজের মধ্যে ধারণ করছে। আপনি অসামাজিক হয়ে বাচ্চাকে সামাজিক বানাতে পারবেন না। ঠিক তেমনই নিজে ভালো মানুষ না হয়েও পারবেন না শুধু বুঝিয়ে-শুনিয়ে বাচ্চাকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে।

ইসলাম আমাদেরকে ছোটো-বড়ো সকল সম্পর্কের প্রতি সম্মান করতে শেখায়, সম্মান দেখানোর তাগিদ দেয়; এটি মুসলিম ব্যক্তিত্বের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু দিনে

দিনে আমাদের বাচ্চারা এমন এক পরিবেশে বেড়ে উঠছে, যেখানে ভদ্রতা, সম্মান দেখানো তাদের কাছে অহেতুক কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুরব্বিদের দেখলে সালাম দেওয়া, তাদের জন্য জায়গা করে দেওয়া, তারা আশেপাশে থাকলে নিচু স্বরে কথা বলা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো তাদেরকে শেখানো হয় না। এর বড়ো কারণ হলো, আমরা পিতামাতারা এ ব্যাপারগুলো মেনে চলি না। পিতামাতাদের এই আচরণটি সংশোধন করতে হবে। আমাদেরকে দেখেই আমাদের বাচ্চারা শিখবে। আমরা যদি আমার বাসার কাজের লোকদের সাথে খারাপ ব্যবহার করি, রিকশাওয়ালাদের সাথে খারাপ ভাষায় কথা বলি, বাসায় ফকির এলে খারাপ মন্তব্য করে তাড়িয়ে দিই; তাহলে এগুলে আমাদের বাচ্চারা শিখবে। পরবর্তী সময়ে তারাও তাদের জীবনে অন্যদের ঠিক এভাবে অসম্মান করে যাবে।

বাবা-মায়ের আচার-ব্যবহার ও স্বভাব-প্রকৃতি থেকে প্রতিটা দোষ-গুণ বাচ্চারা শোষণ করে নেয়। সব ক্ষেত্রে তারা বাবা-মাকেই নিজেদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। তাই নিজেরা ভালো অভ্যাসগুলো অনুশীলন করে বাচ্চাদের মাঝে সুন্দর, সৎ, ভালো ও উত্তম গুণাবলির বীজ বপন করতে হবে। আর আদর্শ মানবের কাজ হলো সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার অনুপ্রেরণা জোগানো। বাচ্চারা জীবনে চলার পথে আটকে গেলেই যেন সেই আদর্শ মানবের জীবনের দিকে তাকিয়ে অনুপ্রেরণা খুঁজে নিতে পারে, তারা যেন খুঁজে নিতে পারে নিজেদের করণীয় এবং বাধা অতিক্রম করার সাহস,সেই সাথে জোগানোর কর্তব্য বাবা-মায়েদেরই।**[১৫]

❖ পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন কাজ 'শিশু হওয়া'

গতকাল বিকেলে এক ভাবির বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। কথায় কথায় বিভিন্ন প্রফেশনে 'কঠিনতার' প্রসঙ্গ উঠল। আলাপের একপর্যায়ে ভাবির ১০ বছর বয়সি ছেলেটি হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, তোমরা সবাই ভুল বলছ। পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো 'শিশু হওয়া'। আমরা সবাই ঘুরে বাচ্চাটির দিকে তাকালাম। সে একটুও দমে না গিয়ে বিজ্ঞের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, আমার কথার স্বপক্ষে আমি অনেক যুক্তি দিতে পারব।

তাকে তখন যুক্তি দেখানোর অনুমতি দেওয়া হলো। লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে সে নিজের মতো করে বলতে শুরু করল-একটা শিশুকে যে কঠিন কঠিন কাজগুলো নিয়মিত করতে হয়, বড়দেরকে কখনোই তার কিছু করতে হয় না। শিশুদেরকে প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই স্কুলের জন্য তৈরি হতে হয়। ইচ্ছে না থাকলেও নাস্তা খেতে হয়। দেরি হলে আম্মু বকা দেন। আর স্কুলে যাওয়ার পর তো শুধু কাজ আর কাজ— অঙ্ক, ইংরেজি, বিজ্ঞান, অঙ্কন, এক্সারসাইজ ক্লাস—একটার পর একটা চলতেই থাকে। এক ঘণ্টার ব্রেক, তবুও টিচার সারাক্ষণ আশেপাশে ঘোরাঘুরি করেন। দুষ্টুমি করলে শাস্তি দেন। বাসায় ফিরতে না ফিরতেই আবার শুরু হয় গোসল, খাওয়া, এক ঘণ্টা বিশ্রাম। তারপর বসে বসে হোমওয়ার্ক করা, দেড় ঘণ্টা খেলা করা, বিকেলে নাস্তা করা। আবার পড়তে বসা। কুরআন, জেনারেল নলেজ আরও কতকিছু শেখা! সারাক্ষণ একটার পর একটা করতেই থাকা। কোনো কিছু করতে একটু দেরি হলেই বড়রা চিৎকার শুরু করেন। তাদের ধারণা—শিশুরা মানুষ নয়; গাড়ি। তাদের কাজ শুধু ছোটাছুটি করা।

ওর কথা শুনে আমরা নিশ্চুপ হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। কী বলব, ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। নিজের শৈশবকে ঘিরে একটা শিশুর এতটা অভিমান সত্যিই অবাক করার মতো। শিশুদের মনে নানা কারণে অভিমান তৈরি হয়। আর এইসব অভিমানের সূত্রপাত ঘটে যখন তাকে কোনো কিছু বুঝিয়ে না বলে চাপিয়ে দেওয়া হয়। ধরা যাক, শিশু একটা জিনিস চাইছে, এখন সেটি কেন তাকে দেওয়া যাবে না, সেটা যদি বুঝিয়ে বলা হয়, তাহলে তার মনে অভিমান জন্মায় না। কিন্তু বুঝিয়ে না বলে যদি কঠোরতার আশ্রয় নেওয়া হয় কিংবা তার চাওয়াটাকে গুরুত্ব দেওয়া না হয়, তাহলে শিশুর মনে অভিমান জন্ম নেয়।

আমি বাচ্চাটিকে কাছে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বাবা, বড় হয়ে তুমি কী হতে চাও?

জবাবে সে বলল, আমি ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই।

'ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য তোমাকে কী করতে হবে?'

'বেশি বেশি পড়াশোনা করতে হবে।'

'পড়াশোনা করার জন্য কোথায় যেতে হবে?'

'স্কুলে যেতে হবে।'

তাহলে দেখা যাচ্ছে, তোমার স্কুলে যাওয়ার কারণ হলো নিজের স্বপ্ন পূরণ করা। এখন যদি তুমি না খাও, তাহলে শক্তি পাবে কীভাবে? আর শক্তি না পেলে পড়াশোনা করবে কীভাবে? তার অভিযোগের প্রতিটা বিষয় 'কেন সে করে' বা 'কেন তাকে করতে হয়' প্রশ্ন করে করে তার মুখ দিয়েই বলালাম। তখন ও বলল, আম্মু তো আমাকে এভাবে বুঝিয়ে বলেননি, তাই আমি বুঝতে পারিনি। এখানেই মূল সমস্যা। আমরা বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলার চাইতে বেশিরভাগ সময় হুকুম করতে পছন্দ করি, যার ফলে বাচ্চারা বুঝতে পারে না, সে যা করছে বা তাকে দিয়ে যা করানো হচ্ছে, এতে মূলত তারই উপকার হচ্ছে। আর এই না বোঝাটাই বাচ্চার মনে রাগ, ক্ষোভ, অভিমান জন্ম দেয়।

শিশুদেরকে বুঝিয়ে বললে যে তারা বোঝে, এটি তার আরও একটি প্রমাণ। তাই দৈনন্দিন প্রতিটা কাজ তাকে কেন করতে হবে, করলে কী হবে আর না করলে কী হবে-যদি বুঝিয়ে বলা যায়, তাহলে কোনো কাজকে আর তার কাছে বোঝা মনে হবে না। তাকে বাধ্য করে করানো হচ্ছে, মনে এমন চিন্তার উদ্রেকও হবে না। ভেতরে দানা বাঁধতে পারবে না অভিমান। জেনে রাখা ভালো, চাপা অভিমান শিশুদের মানসিক বিকাশকে ভয়ংকরভাবে ব্যাহত করে।

শিশুদের যেকোনো অভিযোগ মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। অভিযোগের পেছনে যুক্তি/কারণ তাদের মনে কাজ করছে, তা বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। খুঁজে বের করে তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। কোন বিষয়টি বুঝতে সে ভুল করেছে, তাও চিহ্নিত করে দিতে হবে।

তাদের ‘ছেলেমানুষির’ সঙ্গে কখনোই রাগ বা বিরক্ত দেখানো যাবে না। অন্যথায় শুধু এই বুঝিয়ে না বলার কারণে সুন্দর শৈশবকে ঘিরে তার মনে তৈরি হতে পারে হতাশা। তাই শিশুদের যেকোনো বিষয় বুঝিয়ে বলার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের দৃঢ়প্রত্যয়ী ও সাপোর্টিভ হওয়া উচিত।**[১৬]

❖ মনোযোগ পাওয়া

বাচ্চারা সবসময় আপনার মনোযোগ পেতে চায়। আপনার মনোযোগ পাওয়ার জন্য বাচ্চা ভালো মন্দ যেকোনো কাজ করতে দ্বিধা করবে না। আপনি যতক্ষণ না তার দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন ততক্ষণ বাচ্চারা তাদের ক্রিয়া-কলাপ পুনরাবৃত্তি করতেই থাকবে। তারা নেতিবাচক কি ইতিবাচক কাজ করছে এ ব্যাপারে তাদের কোনো খেয়াল থাকে না। আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে। তাই পিতামাতা হিসেবে খেয়াল রাখবেন আপনার বাচ্চা যেন নিজেকে আপনাদের কাছ থেকে বঞ্চিত মনে না করে। আপনার বাচ্চা যেন বুঝে তাদের উপস্থিতি আপনাদের জন আনন্দের। আপনার বাচ্চা কী করছে না করছে সবকিছুই আপনারা লক্ষ করছেন—এ ব্যাপারটি বাচ্চাকে বোঝাতে হবে। যদি কোনো শিশু নিঃশব্দে খেলে এবং কেউ তাকে খেয়াল করছে না তখন সে লড়াই বা দুষ্টুমির মাধ্যমে সবার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করবে। আবার একটা বাচ্চা খুব সুন্দর করে নিজের রুম গোছাচ্ছে, ছবি আঁকছে এবং সবাই তার প্রশংসা করছে; তখন সে আরও সুন্দর করে ছবি আঁকতে শুরু করে এবং এভাবে সে মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে। পিতামাতার উচিত তাদের সন্তানের ইতিবাচক আচরণগুলো মনোযোগ সহকারে গ্রহণ করা এবং নেতিবাচক আচরণগুলোকে উপেক্ষা করা। উপেক্ষা করার মাধ্যমে খেয়াল রাখতে হবে, বাচ্চাও যেন তাদের জীবন থেকে কাজটি উপেক্ষা করতে শেখে। কারণ, এর দ্বারা সে মনোযোগ হাসিল করতে পারছে না।

উদাহরণ: আপনার বাচ্চা আপনার জন্য একটি সুন্দর কিছু এঁকে নিয়ে এলো। আপনি যদি তাকে দেখে বলেন, 'মাশাআল্লাহ! কত সুন্দর এঁকেছ তুমি, আমি অনেক পছন্দ করেছি, অনেক সুন্দর হয়েছে, তুমি আরও সুন্দর কিছু আমার জন্য এঁকে আনবে।' ইতিবাচক মন্তব্যগুলোর মাধ্যমে আপনার বাচ্চা বুঝতে পারবে, সে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছে। তখন দুষ্টুমি বা অন্যান্য নেতিবাচক কাজগুলো বাদ দিয়ে সে এগুলোর প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠবে। এ ছাড়াও বাবা-মায়ের সর্বদা সন্তানের নেতিবাচক আচরণ উপেক্ষা করা উচিত, যাতে সে এটির পুনরাবৃত্তি না করে।

উদাহরণ: আপনার বাচ্চা যদি কিছুক্ষণ পরপর ফ্রিজ থেকে জিনিসপত্র বের করে মাটিতে ফেলে দেয়, জামা-কাপড় অগোছালো করে, খেলনাগুলো বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখে আর আপনি তাকে দেখে চিৎকার করে বলেন, 'তোমাকে কতবার বলেছি ফ্রিজ খুলবে না, জামা-কাপড়গুলো এলোমেলো করবে না, খেলনাগুলো গুছিয়ে রাখবে অথচ তুমি আমার কথা

শুনছ না। বারবার এসব করেই যাচ্ছ।' আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আপনার বাচ্চা আপনার বকা খেয়ে বা আপনাকে রাগতে দেখেও এগুলো করা থেকে বিরত হবে না। কারণ, সে জানে এগুলো করার মাধ্যমে সে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছে। যদিও সেটা নেতিবাচক। এজন্য আপনার এগুলো উপেক্ষা করা উচিত। যখন আপনার বাচ্চা দেখবে কোনোভাবেই এগুলো করে সে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারছে না, তখন ক্লান্ত হয়ে এগুলো করা এমনিতেই ছেড়ে দেবে।**[১৭]

❖ তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ

আমরা মনে করি বাচ্চারা অনেক ছোটো। তাদের বুদ্ধির পরিসর অনেক কম। তারা অনেক কিছুই বুঝতে পারে না। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভুল। বাচ্চারা তীক্ষ্ণভাবে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করতে পারে। যদি সে দেখে আপনি নবজাতককে নিয়ে সারা দিন ব্যস্ত সময় পার করছেন, তাকে গোসল করাচ্ছেন, খাওয়াচ্ছেন, আদর করছেন, ঘুম পাড়াচ্ছেন; তখন সে মনে করবে আপনার সকল মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু এই বাচ্চাটি। তাই ছোটো বাচ্চাকে দেখাশোনা করতে গিয়ে বড়ো বাচ্চাকে বঞ্চিত করবেন না। এ ক্ষেত্রে একটা চমৎকার বিষয় অবলম্বন করতে পারেন। আপনারা দুইজন মিলে ছোটো সন্তানের দেখাশোনা করতে পারেন। দুজন মিলে বাচ্চার খাবার তৈরি করা, খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, জামা-কাপড় পরানো ইত্যাদি কাজগুলো করতে পারেন। এতে করে আপনার সাথে তার সময় কাটানো হবে এবং বন্ধন দৃঢ় হবে। আর আপনিও উভয়কেই সময় দিতে পারবেন।**[১৮]

❖ পরিবারের মধ্যে সন্তানের অবস্থান

আপনার সন্তান নিজের পরিবারে তার অবস্থান যেরকমভাবে অনুভব করবে, এর ওপর নির্ভর করে তার ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠবে। যদি আপনার একজন সন্তানকে আরেকজন সন্তানের চেয়ে বেশি মনোযোগ দেন, তাহলে যাকে অবহেলা করছেন সে আপনাদের মনোযোগ পাওয়ার জন্য নেতিবাচক কাজগুলো করতেও দ্বিধা করবে না। তাই এ ব্যাপারে সতর্ক হোন। আপনাদের প্রথম সন্তান আপনাদের প্রচুর ভালোবাসা, আদর-আহ্লাদ এবং পরিপূর্ণ মনোযোগ পেয়ে বড় হতে থাকে। কিন্তু যখনই আপনার দ্বিতীয় সন্তান আসে তখন আপনার প্রথম সন্তান মনে করে এই বাচ্চাটি তার জন্য হুমকিস্বরূপ। কেননা, এখন তার বাবা-মা বেশিরভাগ মনোযোগ এই নবজাতকের জন্য রেখেছেন। সে মনে মনে এই সন্তানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্ক গড়ে তোলে। এতে করে ভাই বোনদের মাঝে বিরূপ পরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং সংসারে অশান্তি নেমে আসে। তাই পরিবারে সন্তানদের অবস্থান এবং প্রত্যেকের প্রতি সমান মনোযোগ নিশ্চিত করুন। তারা যেন কখনোই নিজেদেরকে অন্য ভাই/বোনের চেয়ে হীন ও অমনোযোগের পাত্র মনে না করে। তারা যেন মনে করে—তাদের বাবা-মা সব ভাইবোনকেই সমান ভালোবাসে এবং সবার প্রতিই পূর্ণ মনোযোগী।

একটা শিশুকে ছোটবেলা থেকেই পরিবারের প্রতি সহানুভূতিশীল করে গড়ে তোলা উচিত। আদর-ভালোবাসা দেওয়ার সাথে সাথে বাবা-মাকে এসবের মর্ম বোঝানোর দায়িত্বও পালন করতে হবে। বাবা-মা ও পরিবারের সদস্যদের আচার-আচরণ, কথাবার্তা, চালচলন সব কিছুই শিশুদের প্রভাবিত করে, জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাই বুঝতে শেখার পর থেকে শিশুদের জানিয়ে দেওয়া উচিত, তাদের জীবনে বাবা-মা ও পরিবারের গুরুত্ব কত বেশি। তাদের এই পৃথিবীতে আসা থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে বড় হওয়ার পেছনে বাবা-মা ও পরিবারের অবদান কত ব্যাপক।

কথায় আছে—ভালো সেলাই মেশিন ও দক্ষ কারিগর না থাকলে ভালো কাপড়ও নষ্ট হতে পারে। তেমনই সঠিক শিক্ষার অভাবে ব্যাহত হতে পারে একটি শিশুর মানবিক গুণসমূহের সুষ্ঠু বিকাশ।**[১৯]

❖ একটু বুকে টেনে নাও না মা!

মায়ের সাথে রাস্তায় সিগন্যাল পার হচ্ছিল ছয় বছর বয়সি বাচ্চাটি। হাতে ছিল দুটি বই। ছোট মানুষ, তাই কৌতূহলী চোখে বিভিন্ন দিকে তাকাতে তাকাতে হাঁটছিল। হঠাৎ তার হাত থেকে বইগুলো পড়ে গেল। ঘাবড়ে গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির দিকে একবার আর অসহায় চোখে মায়ের দিকে আরেক বার তাকাল সে। মা তাকে টেনে উঠিয়ে রাস্তা পার করেই ধমক দিয়ে বললেন, কতবার বলেছি তোমাকে, রাস্তা পার হওয়ার সময় সাবধানে চলতে? যদি গাড়ি চলা শুরু করত? আর যদি কখনো এমন করো, দেখো তোমাকে কী করি! প্রত্যুত্তরে বাচ্চাকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে দেখে মা কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, তাকিয়ে থাকতে হবে না, যাও, হাঁটো।

কয়েকটি বাচ্চা মিলে ছুটোছুটি খেলছিল; তাদের মায়েরা পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন। একটি ছেলে খুব জোরে ছুটছিল, মা তাকে বারবার সাবধান করছিলেন। কিছুক্ষণ পর সে মাটিতে পড়ে গেল। মা ছুটে গিয়ে তাকে টেনে তুলে গালে কষে দিলেন এক চড়। তারপর বললেন, তোমাকে বলেছিলাম না এভাবে ছুটবে না? খুব ভালো হয়েছে। একদম উচিত শিক্ষা হয়েছে। আর কখনো আমার কথা অমান্য করবে?

একে তো পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছে, তার ওপর মায়ের অমন শাসনে বাচ্চাটি ঝরঝর করে কেঁদে দিল।

ওপরের ঘটনা দুটি আমার চোখে দেখা। ঘরে-বাইরে সব জায়গাতেই শিশুরা এমন অনিচ্ছাকৃত ভুল বা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। কোনো কোনো বাবা-মায়ের আচরণ তখন ওপরের ঘটনাগুলোর মতো হয়। যে সময় বাচ্চাদের বুকে জড়িয়ে ধরে আশ্বস্ত করা দরকার, সেসময় তাদের সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করি আমরা। আরেকটা জিনিস লক্ষ করেছি, পিঠাপিঠি ভাই-বোনেরা কোনো কিছু নিয়ে ঝগড়া বা মারামারি করলে বেশিরভাগ সময় বাবা-মা ছোটজনকে সাপোর্ট করেন। ভুল ছোটজনের থাকলেও বকা বড়জনকেই খেতে হয়, মাফও তাকেই চাইতে হয়।

এ সমস্ত ঘটনা বা আচরণ একটা শিশুর মনোজগতে কী ধরনের প্রভাব ফেলে, তা আমরা চিন্তাও করে দেখি না। 'বাবা-মা সবচেয়ে বড় আশ্রয়'—এই বিশ্বাস বাচ্চাটা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলে। যেকোনো বিষণ্ণতা, কষ্ট কিংবা ব্যর্থতায় সে বাবা-মায়ের কাছে ছুটে আসতে পারে না

বা বলা যায়, আসার সাহস পায় না। কারণ তার মনের আকাশে জমে থাকে নিরাশার মেঘ। অনিচ্ছাকৃত অন্যায় বা ভুলের কারণে বাচ্চাদের সাথে কখনোই এমন আচরণ করা ঠিক নয়। এর ফলে বাবা-মা আর বাচ্চাদের মধ্যে যে অদৃশ্য দেয়াল তৈরি হয়, পরবর্তী সময়ে এ কারণেই বাচ্চারা নিজেদের দোষ-ভুল ইত্যাদি গোপন করতে শেখে আর কমে যায় সংশোধনের সুযোগ।

আমার ছেলেটা যখন এ ধরনের অনিচ্ছাকৃত ভুল বা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে, তখন ওর ভীত চোখের দিকে তাকালে আমি অনুভব করি, ভয়, অপরাধবোধ সবকিছু মিলিয়ে সে আসলে বলে উঠতে পারছে না—আমাকে একটু বুকে টেনে নাও না মা!

আমি তো মা, তাই বুঝি। সব মা-ই বুঝতে পারেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একটি মেয়েকে—যখন সে মা হয়—এই ক্ষমতা দিয়ে দেন, যেন নেতিবাচক পরিস্থিতিগুলোতে সে তার বাচ্চার সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় হতে পারে। কারণ তখনই একটি শিশুর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় মায়ের মমতাময় আশ্রয়ের।**[২০]

❖ শিশুদের কাউন্সেলিং

আমরা অভিভাবকরা বেশিরভাগ সময় ভুলে যাই, আমরাও একসময় ছোট ছিলাম। বাবা-মা যখন জোর করে কোনো কিছু চাপিয়ে দিতেন কিংবা আমাদের ছোট ছোট ইচ্ছা-খুশি-আনন্দগুলোকে মূল্যায়ন করতেন না, কতটা অসহায় অনুভব করতাম আমরা। হয়তো বাবা-মা ঠিক কাজটিই করতেন, হয়তো আমরা ইচ্ছা-খুশি-আনন্দের যে উপকরণগুলোকে পছন্দ করেছিলাম, সেসব আমাদের ভুল পছন্দ ছিল। কিন্তু বুঝিয়ে না বলে চাপিয়ে দেওয়ার কারণে আমরা নিজের ভুল তো বুঝতে ব্যর্থ ছিলামই, সাথে সাথে নিজের ভেতর বাবা-মায়ের সম্পর্কে ভুল বারণাও লালন করেছি। আসলে নিজেদের সিদ্ধান্ত জোর করে সন্তানের ওপর চাপিয়ে দিলে উপকারের বদলে অপকারই বেশি হয়। সন্তানের কল্যাণ সাধন করতে দিয়ে কল্যাণকামী হওয়ার বদলে আমরা হয়ে যাই 'ইমোশনাল অ্যাবিউজার'। তাই জোর করে সন্তানের ওপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে না দিয়ে যুক্তির মাধ্যমে এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যাতে সন্তানেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা মেনে নিতে বাধ্য হয়। আর এর ফলে আরেকটি গরুত্বপূর্ণ যে বিষয় অর্জিত হয়, তা হলো, শিশুরা ছোটবেলা থেকেই যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে শেখে, ভাল-মন্দকে যাচাই-বাছাই করতে শেখে।

আমরা যখন বাচ্চাকে কিছু শেখাতে চাই কিংবা সে কোনো ভুল করলে তাকে শোধরাতে যাই, কখনোই সেই বিষয়টা সরাসরি তাকে বলে ফেলবো না। বরং কাজটা ওর কেন শেখা উচিত বা যে কাজটি করেছে, তা কেন ভুল, পয়েন্ট আকারে গোটা বৃত্তান্ত তার সামনে উপস্থাপন করবো। এভাবে সে নিজের ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝে নিতে পরে এবং করণীয়-বর্জনীয় স্পষ্টভাবে জেনে নিয়ে সংশোধন হওয়ার সুযোগ পায়।

মজার ব্যাপার হলো, বাচ্চারা বিভিন্ন সময় ঠিক একই কাজ করে আপনাকে তার পক্ষে নেওয়ার জন্য ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে যুক্তি দিয়ে এমন একটা আবহ তৈরি করবে যে, তখন মানতে বাধ্য। অর্থাৎ সেটি যদি আসলেই মানার মতো হয় তখন আপনি আর না করবেন না। কারণ আপনি যদি ওর ভাবনাকে সবসময় অবমূল্যায়ন করি, তাহলে একসময় সেও আপনার ভাবনাকে মূল্য দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে না।

আসলে শিশুরা বাবা-মাকে বন্ধু হিসেবে পেতে পছন্দ করে, শাসক হিসেবে নয়। তার চেয়েও বড় কথা হলো—ভালোবাসা যা করার ক্ষমতা রাখে, শাসন তা করতে গিয়ে অধিকাংশ সময়

ব্যর্থ হয়। শাসনের কারণে প্রায়ই শিশুদের মনে অভিমান আর ক্ষোভদানা বাঁধে। সেই ক্ষোভের কারণে একদিকে যেমন তাদের ব্যক্তিত্ব গঠন ব্যাহত হয়, অন্যদিকে ব্যাহত হয় বাবা-মায়ের সঙ্গে সন্তানদের পারস্পরিক বোঝাপড়া।

কাউন্সেলিং অর্থ নিজের ধারণা, মনোভাব ও বিশ্বাসকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া নয়; বরং সমস্যার সম্মুখীন যে হচ্ছে, তার কাছে সরাসরি সেই বিষয়টি উপস্থাপন না করে আলোচনার মাধ্যমে তা মোকাবেলার পথ বের করে দেওয়া। যেন সে সমস্যার ব্যাপারে বাস্তব উপলব্ধি লাভ করে নিজের অবস্থার সঙ্গে খাপ ঘইয়ে নিতে পারে। অর্থাৎ কাউন্সেলরের মূল কাজ হচ্ছে প্রতিটি সমস্যার নির্দিষ্ট মাধানে পৌঁছতে সাহায্য করা। কাউন্সেলিং করতে গিয়ে মাঝে মাঝে কাউন্সেলরদের এমন কিছু ছেলে-মেয়ের সাথে পরিচয় হয়, যাদেরকে সমাধানে পৌঁছতে সাহায্য কর তো দূরে থাক, তাদের সাথে কথা বলাটাই দুঃসাধ্য ব্যাপার মনে হয়। কারণ যুক্তির প্রয়োগ বা গ্রহণ কোনোটাই তারা শেখেনি কিংবা নিজেদের বেড়ে ওঠার পরিবেশ থেকে সেটা পায়নি। তাদের ওপর সবসময় সবকিছু চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে তারাও অন্যের ওপর নিজের মতামত চাপিয়ে দিতে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছে।

আমি এ ধরনের ছেলে-মেয়েদের ওপর প্রচণ্ড মায়া অনুভব করি। আতঙ্কিত হই এই ভেবে, না জানি কেমন ছিল সেই পরিবেশ, যা তাদের চিন্তা করবার ক্ষমতাকে একটা কোণে এনে বন্দি করে ফেলেছে! চারপাশকে নিজেদের তৈরি কারাগার বানিয়ে ওরা সেখানে সেচ্ছাবন্দি হয়ে আছে। পরিবেশই তাদেরকে বাধ্য করেছে সেখানে বন্দি হতে। এখন সেই কারাগার ভাঙার জন্য দরকার প্রচন্ড শক্তি।

সমাজবদ্ধ জীব মানুষের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো নিজেকে জয় করা। পরিবেশ-প্রতিবেশের আগ্নেয়গিরি থেকে নিজেকে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখে সামনে এগিয়ে চল ছাড়া মানুষ খুব উন্নতি করতে পারে না। আর নিজের প্রতি কল্যাণকামিতাই মূলত মানুষকে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার প্রেরণা জোগায়; কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন নিজেকে সঠিক অর্থে ভালোবাসা। যার অর্থ-নিজের অন্যায় ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার না করা। এ জিনিসটা যারা শেখেনি, তাদেরকে আগ্নেয়গিরির উদ্‌গিরণ থেকে বের করে আনা সম্ভব হয় না। সম্পর্কের বন্ধন যাদের জীবনে কখনো আলো হয়ে আসেনি, তাদেরকে বোঝানো যায় না, আলো ও অন্ধকারের মধ্যে আলোই অপ্রতিরোধ্য।

এসব বিষয় একদম ছোট থেকে লক্ষ রাখতে হয়। ছেলেবেলা থেকেই শিশুদের এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত, যেন কোনো বিষয়ে তাদের জোর করতে না হয়। প্রতিটি কাজ বুঝিয়ে বললে তারাও ধীরে ধীরে যুক্তি দিয়ে ভালোমন্দ বিবেচনা করতে শিখে যাবে। মোটকথা শিশুদেরকে সবসময় আদেশ-নিষেধের মধ্যে আটকে না রেখে বরং ভালোবাসা দিয়ে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। তাদের ভুলত্রুটির বিষয়ে বকাঝকা না করে এমনভাবে ধরিয়ে দিতে হবে, যেন তার অপমানবোধ না করে উলটো সেই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে সেসব থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়।**[২১]

❖ শিশুদেরকে চাপিয়ে না দিয়ে বোঝাতে হবে

[এক] বাচ্চাদের স্কুলে বসন্তের ছুটি হওয়ার পর থেকে প্রতিদিনই সবাইকে নিয়ে পার্কে যাওয়া হয়। স্কুলের অনেক বন্ধুও আসে, তাই আনন্দে কাটে ওদের পুরোটা সময়। কিন্তু সমস্যা বাঁধে পার্ক থেকে বাসায় ফেরার সময়। এখানে (ফ্রান্সে) আমরা আসরের সালাত আদায় করে সাড়ে ৬টায় পার্কে যাই। এখন মাগরিবের ওয়াক্ত হয় ৯ টার সময়। তাই সাড়ে ৮ টার মধ্যে আমরা বাসার উদ্দেশে পার্ক থেকে রওনা করি। কিন্তু যেহেতু ওদের বন্ধুরা তখনো পার্কে থাকে এবং খেলা চলতে থাকে, তাই তামাদের বাচ্চাদের মুখগুলো আঁধারে ঢেকে যায়। কেন এখন যেতে হবে? আরেকটু সময় থাকলে কী হয়? আমাদের খেলা এখনো শেষ হয়নি। এখনই নিয়ে যাচ্ছ, এটা ঠিক হচ্ছে না। ইত্যাদি ইত্যাদি নানা অনুযোগ প্রকাশ পায় ওদের কথাবার্তায়। তাই গত কয়েকদিন আগে পার্ক থেকে ফিরে সবাইকে নিয়ে বসে বললাম,আচ্ছা সোনামণিরা, তোমরা কি প্রতিদিনের রুটিনের সবকিছু মেনে চলতে চেষ্টা করো? কেন করো?

জবাব দিল, জি। কারণ সবকিছু ঠিকমতো মেনে চললে আবু-আম্মু খুশি হন আর সপ্তাহ শেষে আমাদেরকে উপহার দেন।

বললাম, এবার বলো, তোমরা সালাত কেন আদায় করো? জবাব দিল, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। সালাত আদায় করলে আমরা জান্নাতে যেতে পারব। আর যা চাইব, সবকিছু অল্লাহ আমাদেরকে দেবেন। বললাম, তার মানে তো তোমরা সালাত মূলত নিজেদের জন্যই পড়ো! কারণ সালাত আদায় করলে আল্লাহ খুশি হবেন এবং তোমাদেরকে জন্নাত দেবেন। সেখানে তোমরা যার যা পছন্দ, তা-ই পাবে।

কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনা করে সবাই আমার সাথে সম্মতি প্রকাশ করল। তখন বললাম, দেখো, পার্ক থেকে ফিরে তোমাদেরকে গোসল করতে হয়; খেলতে খেলতে ক্ষুধা লেগে যায়, তাই খেতে হয়। এসব করে যাতে তোমরা ঠিক সময় অনুযায়ী সালাত আদায় করতে পারো, তাই আমাদেরকে পার্ক থেকে একটু আগে চলে আসতে হয়। এখন বলো, তোমাদেরকে যে আমরা পার্ক থেকে আগে নিয়ে আসি, সেটা কার জন্য? অবশ্যই তোমাদের নিজেদের ভালোর জন্য। যেন তোমরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারো এবং জান্নাতে যেতে পারো। আর তোমরা আল্লাহর

কাছে চাওয়ার জন্য যা যা ঠিক করে রেখেছ, তার সবকিছু পেতে পারো। কারণ তোমরা তো জানেই, আল্লাহ সবার আগে দেখবেন, তোমরা ঠিকমতো সালাত আদায় করেছ কি না।

এরপর থেকে আমাদের সোনামণিরা পার্ক থেকে ফেরা নিয়ে আর একদিনও মন খারাপ করেনি। বলার সাথে সাথে হাসিমুখে বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসার উদ্দেশে রওনা হয়েছে। এভাবে আমরা আরেকবার বুঝতে পারলাম, অভিভাবকরা শিশুদের ওপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে সেটা কেন করতে হবে বা করা উচিত, সুন্দর করে বুঝিয়ে বললে তারা তা বোঝে এবং মেনে চলার চেষ্টা করে। কিন্তু বুঝিয়ে না বললে শিশুরা হয়তো কাজটা করে; কিন্তু তাদের মনে সেই জিনিসকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়ে যায় একধরনের বিতৃষ্ণা। এভাবে অনেক সময় অভিভাবকরা শিশুদের মনে নিজেদের অজান্তেই ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা বুনে দেন।

ইসলামের প্রতিটা বিধান সহজ, সরল, সুন্দর ও জীবনের জন্য কল্যাণকর। না বোঝার কারণে বেশিরভাগ সময় ইসলাম মেনে চলাটাকে জটিল ও কঠিন মনে হয়। তাই শিশুদের সামনে ইসলামের কল্যাণময়তা তুলে ধরে তাদেরকে বুঝিয়ে বলা উচিত, এই বিধানটি কেন মেনে চলতে হবে এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর তরফ থেকে কী পাওয়া যাবে। তাহলে শিশুরা আনন্দচিত্তে সেটা মেনে নিয়ে আমল করার চেষ্টা করবে। প্রতিটি শিশুর মধ্যে লুকিয়ে আছে সেই সম্ভাবনা, যা আমাদেরকে এনে দিতে পারে নতুন সূর্যোদয়। তাই খেয়াল রাখতে হবে, আমাদের ভুলে সেই সম্ভাবনার যেন ক্ষয় না হয়।

[দুই] ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রাতুল দেখল, বিকেলে খেলার সময় শুরু হতে আর মাত্র ২০ মিনিট বাকি আছে। অথচ আম্মু তাকে পড়া দিয়ে বলে গেছেন-মুখস্থ করে না দেখে লিখতে। মুখস্থ করতেই তো ২০ মিনিট লেগে যায়! কখন লিখবে আর কখন ছুটবে খেলার মাঠে? পড়া শেষ হওয়ার আগেই তো বন্ধুরা সবাই দল ভাগাভাগি হয়ে খেলায় নেমে যাবে! এখন খেলে এসে সন্ধ্যায় পড়তে বসবে, এ কথা কি আম্মুকে বলবে? কিন্তু আম্মু যদি বিরক্ত হন?

এখন তাহলে কী করা যায়, ভাবতে শুরু করল রাতুল। সাথে সাথে মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। উঁকি দিয়ে দেখল আম্মু কিছু একটা রান্না করছেন। ঝটপট খাতা বের করে বই দেখে সে পুরো লেখাটা কপি করে ফেলল। তারপর আম্মুর কাছে গিয়ে বলল, আম্মু, আমি এখন খেলতে যাই?

'ঠিক আছে বলে' হাসিমুখে ছেলেকে বিদায় দিয়ে আবারও রান্নায় মনোযোগ দিল নায়লা। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ তার খেয়াল হলো, আজ একবারও রাতুলের পড়ার শব্দ কানে আসেনি। রাতুল যখন গুনগুন করে পড়ে, ভীষণ ভালো লাগে শুনতে। রান্না বন্ধ করে ছেলের রুমের দিকে রওনা হলো নায়লা। টেবিলে থাকা খাতা দেখে তার বুঝতে কষ্ট হলো না, ঘটনা আসলে কী ঘটেছে!

টেবিলের যে জায়গাটিতে খাতা রেখে গিয়েছিল, সন্ধ্যায় পড়তে বসে অন্য জায়গায় দেখে রাতুলের মনে খটকা লাগল। সে অপরাধ আর লজ্জা-মেশানো চোখে আম্মুর এক তাকাল। নায়লা এবার কিছুক্ষণ ছেলের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, কাজটা কি তুমি ঠিক করেছ? রাতুল মাথা নিচু করে চুপ হয়ে রইল। নায়লা বলল, মুখস্থ করে আবার লেখো। আমি তোমার জন্য নাস্তা বানাচ্ছি।

রান্নাঘরে আসার কিছুক্ষণ পর চাপা কান্না আর ফোঁপানোর শব্দ শুনতে পেল নায়লা। তাকিয়ে দেখে, রাতুল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। হাত বাড়িয়ে দিতেই ছুটে এসে আম্মুকে জড়িয়ে ধরে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আম্মু, আমি আর কখনোই এমন করব না। নায়লা বলল, কান্না করছ কেন বাবা! আমি কি তোমাকে কিছু বলেছি? আচ্ছা তুমি এমন করলে কেন, সেটা কি আম্মুকে বলবে? রাতুল বলল, আমার বন্ধুরা বলেছে, বিকেল হলেই আমাদের খেলা শুরু হয়ে যাবে। ওরা আমাকে বাদ দিয়ে দল ভাগাভাগি করে ফেলছিল কিনা, সেজন্য আমি তাড়াতাড়ি যেতে এমন করেছি। আর কখনো করব না আম্মু।

নায়লা বলল, সে কথা তুমি আম্মুকে বললেই তো পারতে, তাই না? আচ্ছা যাও, এবার পড়া মুখস্থ করে লিখে আম্মুকে দেখাও।

এতুল বলল, তুমি রাগ করোনি তো আম্মু? নায়লা হেসে বলল, না বাবা, আমি রাগ করিনি।

মায়ের কাছ থেকে এসেই বই নিয়ে পড়তে বসে গেল রাতুল। পড়া শেষ করে না দেখে লিখে আম্মুর কাছে নিয়ে এলো। ছেলেকে আদর করে কাছে টেনে নায়লা বলল, রাতুল, তুমি আজ যা করেছ, সেটা খুব ভুল কাজ, তা কি জানো?

রাতুল বলল, আমি আর কখনোই এমন করব না আম্মু। প্রমিজ করে বলছি।

নায়লা বলল, তুমি কি জানো রাতুল, তুমি যদি এমন কোনো কাজ করো, যেটা পৃথিবীর কেউ দেখতে পায় না, সেটাও আল্লাহ দেখতে পান?

রাতুল বলল, জি আম্মু, জানি। আল্লাহ সবসময় সবকিছু দেখতে পান। নায়লা বলল, তুমি কি জানো, আমাদেরকে কার খুশির জন্য সব কাজ করতে হবে?

রাতুল বলল, আল্লাহর খুশির জন্য। নায়লা বলল, তুমি আজ যা করেছ, তাতে কি আল্লাহ খুশি হতেন? তোমার ভুল কাজটা না দেখলে বা না জানলে আমি হয়তো খুশি হতাম; কিন্তু আল্লাহ তো সবসময় সবকিছু দেখতে পান। তুমি যে আম্মুকে বোকা বানাচ্ছ, সেটাও আল্লাহ দেখতে পেয়েছেন। তাই আর কখনো এমন করবে না, কেমন?

ওপরের চিত্রটি একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে, হরহামেশা আমাদের চারপাশে এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। শিশুরা বিভিন্ন কারণে এমন কিছু কাজ করে ফেলে, যা মূলত অন্যায়। কিন্তু বেশিরভাগ সময় তারা সেসব কাজ অন্যায় বুঝে করে না: বরং এটা করার পেছনেও তাদের কাছে কোনো না-কোনো যুক্তি থাকে। অভিভাবকদের উচিত সেই যুক্তি শোনা এবং শিশুদের শুধরে দেওয়া। অর্থাৎ সে যে ভুল করেছে, সেটা উপলব্ধি করাতে সহায়তা করা। নায়লা আর রাতুলের ঘটনাটি খেয়াল করলে দেখা যায়-

১. নায়লা যদি অন্যায়টির কারণে বকাঝকা করত কিংবা গায়ে হাত তুলত, তাহলে কিন্তু রাতুলের মধ্যে অপরাধবোধ জাগত না; লজ্জা মিশ্রিত অশ্রু ঝরত না তার চোখ থেকে।

২. শাস্তি পেয়ে যাওয়ার কারণে বিষয়টি নিয়ে রাতুলের মনে তেমন কোনো ভাবনা কাজ-করত না। কারণ শাস্তির বেদনায় সে উপলব্ধি করার সুযোগ পেত না; বরং সেখানে জায়গা করে নিত, 'আম্মু তাকে একটুও বোঝেন না বা খেলার সময় পড়তে বসান' রকমের অভিমান।

৩. নায়লা যদি বলত, খেলতে যাওয়ার জন্য তুমি ফাঁকিবাজি করেছ, যাও, আজ থেকে তোমার খেলাধুলা বন্ধ, তাহলে রাতুলের ধারণা সঠিক প্রমাণিত হতো, আম্মু তার ইচ্ছার কথা শুনে বিরক্ত হন। অথচ খেলার সুযোগ দেওয়ার কারণে রাতুল বুঝতে পারবে, সে আসলেই ভুল করেছে। তার উচিত ছিল আম্মুকে এ কথা বলা, সে খেলে এসে তারপর পড়বে।

৪. আম্মু অন্যায় নিয়ে কিছুই না বলার কারণে রাতুল নিজের ভুল নিয়ে চিন্তা করার জন্য অনেক সুযোগ পেয়েছে। এর ফলে যখন নায়লা বুঝিয়ে বলেছে, খুব সহজেই রাতুল বুঝেছে এবং মেনে নিয়েছে।

৫. ছোটবেলা থেকেই আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সন্তানদের চিন্তাভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে হবে। তাহলে বাবা-মায়ের অগোচরেও কোনো অন্যায় করার আগে তারা চিন্তা করবে-আল্লাহ সবসময় সবকিছু ও সবাইকে দেখতে পান। তিনি এখন তাকে দেখছেন এবং অসন্তুষ্ট হচ্ছেন।

এখন প্রশ্ন জাগে, 'শিশুদেরকে চাপিয়ে না দিয়ে বোঝাতে হবে'-বিষয়টা কি তাদের অন্যায় বা ভুলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য?

উত্তর হলো, জি, তারা ভুল বা অন্যায় করলেও শাসনের বদলে সোহাগের নীতি গ্রহণ করে বুঝিয়ে বলতে হবে। তাকে ভালো জিনিস যেমন আমরা হাতে ধরে শেখাই, ভুল বা অন্যায়ও এভাবে ধরে ধরে বুঝিয়ে দিতে হবে। পরিণতি জানাতে হবে। আমরা যখন ভুলের পরেও সোহাগ করে তাদেরকে কথা বলার সুযোগ দেব, এতে অভয় পেয়ে তারা মনের কথা বলবে, তাদের ভেতর কোনো যুক্তি থাকলে সেটাও প্রকাশ করবে। তখন সমস্যা, কারণ, সমাধানের উপায় ইত্যাদি সব আমাদের সামনে খোলাসা হয়ে যাবে এবং আমরা সহজে তাদের সমস্ত ভুল, চিন্তা, কথা, কাজ ও যুক্তি সংশোধন করতে পারব। যখন শিশুদের মনে এই নিশ্চয়তা থাকে, বাবা-মা তাদের কথা শুনবেন, প্রতিটি সত্যের জেরে শাসন করবেন না, তখন তাদের মধ্যে লুকোচুরি, গোপন করা, ধোঁকা দেওয়া, মিথ্যা বলা ইত্যাদির প্রবণতা কমে আসে।

অনেক সময় শিশুরা নিজেদের ভুলের পক্ষে যুক্তি দিতে থাকে। তখন তাদের থামিয়ে না দিয়ে সব কথা মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে। তারপর বুঝিয়ে বলতে হবে, কেন তার চিন্তাগুলো ভুল।

শিশুদের আরেকটা স্বভাব-চাঞ্চল্য হলো, তারা প্রায়ই নানা আবদার নিয়ে হাজির হয়। বড়দের উচিত তাদের সেসব চাওয়া যৌক্তিক হলে খুশিমনে গ্রহণ করে নেওয়া আর তা গ্রহণযোগ্য না হলে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলা। এভাবে ধীরে ধীরে একটা সময় শিশুরাও এসব গুণাবলি আয়ত্ত করে নিজেদের মধ্যে ধারণ করে নিতে শিখে যায়।**[২২]

❖ করুণা, দয়া এবং নম্রতা

আপনি আপনার সন্তানদের কাছে জ্বলজ্যান্ত উদাহরণস্বরূপ। তারা তাদের বাবা-মায়ের কথাবার্তা, আচার-আচরণ, চলাফেরা সবকিছু খুঁটিনাটি প্রত্যক্ষ করছে এবং নিজেদের ভেতরে ধারণ করছে। আপনার সন্তান আপনার কাছ থেকেই প্রতিদিন শিখছে। তাই আপনার কথাবার্তায়, আচার-আচরণে যেন নেতিবাচক দিকগুলো ফুটে না ওঠে-এ ব্যাপারে খেয়াল রাখুন। আপনারা বাবা-মা সন্তানের সামনে পরস্পরের প্রতি বিনম্র এবং কোমল ব্যবহার করুন। বাড়িতে অন্যান্য সদস্য এমনকি কাজের লোকদের সাথে আপনার সহানুভূতিশীল আচরণ তাদের মনে দারুণ প্রভাব ফেলে। আপনার সন্তানকে নম্র এবং কোমল ব্যবহারের অধিকারী করে গড়ে তুলুন। এজন্য আপনাদেরকেও সবার আগে এই চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। যদি কখনো ক্রোধ চলে আসে তবে সাথে সাথে তা নিয়ন্ত্রণ করুন এবং আপনার সন্তানদেরকে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখান। রাগের সময় বেশি বেশি আস্তাগফিরুল্লাহ পড়তে থাকুন তাহলে এটা আপনার সন্তানও শিখবে।

উদাহরণ: বাসায় যে মানুষটি আপনাদের কাজে সাহায্য করে তার সাথে কখনো ঝগড়া করবেন না, উঁচু গলায় চেঁচামেচি করবেন না। সে একটি গ্লাস ভেঙে ফেললে তার ওপর ক্রোধ ঝাড়বেন না। তারা যদি অজ্ঞ হয় এবং আপনার সাথে তর্ক করতে থাকে তাহলে আপনি দমে যান এবং দূরে গিয়ে আস্তাগফিরুল্লাহ পড়তে থাকুন। নিজের ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করুন। এটা আপনার সন্তানকে নম্রতার শিক্ষা দেবে।

وَ مَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِين

"আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি শুধু রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।" [সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭]

فبما رحمة من الله لنت لهمً .ولو كنت فظا غليظ القلب لا نْفَضُّوا من حولك فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْر .فَإِذَا عزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ .إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"অতএব, আল্লাহর অনুগ্রহে তুমি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত হতে পেরেছ। আর তুমি যদি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হতে তাহলে নিশ্চয় তারা তোমার সংসর্গ থেকে দূরে সরে যেত। অতএব, তুমি তাদেরকে মাফ করে দাও, তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো এবং কার্য সম্বন্ধে তাদের সাথে পরামর্শ করো; অতঃপর তুমি যখন সংকল্প করবে তখন আল্লাহর

প্রতি নির্ভর করো; এবং নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর ওপর ভরসাকারীগণকে ভালোবাসেন।" [সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫৯]

সন্তানদেরকে মানুষ করার সময় তারা সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার আগপর্যন্ত কখনোই কঠোরতা অবলম্বন করবেন না। তাদের সাথে নরম সুরে কথা বলুন। তাহলে ভালোবাসা নিয়ে তারা আপনার নসিহা গ্রহণ করবে। তাদেরকে কোনো কিছু শেখাতে হলে আপনি যদি কঠোরতা অবলম্বন করেন তাহলে আপনার ভয়ে হয়তো বা তারা সেসময়ে কাজটা করবে; কিন্তু পরবর্তী সময়ে আপনার অনুপস্থিতিতে নিষেধ করা কাজ করতে তাদে দ্বিধা হবে না।

উদাহরণ: আপনার সন্তান তার উস্তাযের কাছে পড়তে চাচ্ছে না, নিজের খেলাধুলায় সময় পার করে দিচ্ছে; এমনটা হলে কখনোই রাগবশত মারধর করে তাকে পড়তে বসাবেন না। বরং তাকে নম্রতার সাথে পড়ালেখার গুরুত্ব বুঝিয়ে দিন। প্রথমেই আপনি বিরূপ হয়ে গেলে সন্তানের ভেতরে পড়াশোনার প্রতি কোনো আগ্রহ জন্মাবে না বরং অনীহা সৃষ্টি হবে এবং পড়াশোনা তার কাছে বিরক্তিকর বিষয়ে পরিণত হবে। আপনার আদর, নম্রতা এবং কোমল ব্যবহার তাকে ভালো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং সে কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করবে। সবসময় যে আদর-আহ্লাদ দিয়ে সন্তানদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখবেন এমনটাও কিন্তু নয়। একবার-দুবার কথা না শুনলে বিকল্প উপায়ে তাদেরকে নসিহা করুন। কিন্তু কখনোই সীমা ছাড়িয়ে যাবেন না, যা সন্তানের ক্ষতির কারণ হতে পারে এবং তাকে মানসিকভাবে ব্যাধিগ্রস্ত করে তুলতে পারে।

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوْفٌ رَّحِيمٌ
"তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার একজন রাসূল, যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, যে হচ্ছে তোমাদের খুবই হিতাকাঙ্খী, মুমিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল দয়াপরায়ণ।" [সুরা আত তাওবা, আয়াত : ১২৮]

واذ قال لقمٰن لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله .ان الشرك لظلم عظيم
"স্মরণ করো যখন লোকমান উপদেশাচ্ছলে তার পুত্রকে বলেছিল, হে বৎস! আল্লাহর সাথে কোন শরিক করো না নিশ্চয় শিরক হচ্ছে চরম জুলুম।" [সূরা লোকমান, আয়াত : ১৩]**[২৩]

❖ সবসময় প্রতিশ্রুতি রাখুন

সন্তানের সাথে আপনি যেরূপ ব্যবহার করবেন, তার ভেতরে ঠিক সেই ব্যবহারগুলোই প্রতিফলিত হবে। আপনি যদি সবসময় তার সাথে ধমকের সুরে কথা বলেন তাহলে সেও আস্তে আস্তে এভাবেই কথা বলা শুরু করবে। এমনকি তার স্বাভাবিক কথাবার্তাগুলোও ধমকের মতো শোনাবে। আমরা সন্তানের কাছ থেকে কোনো কিছু আদায় করার জন্য অথবা তাদের ইতিবাচক কাজের পুরস্কার হিসেবে বেশকিছু ওয়াদা করে থাকি। কিন্তু কাজের ব্যস্ততা, ভুলে যাওয়া ইত্যাদি নানা কারণে ওয়াদাগুলো পালন করার ব্যাপারে আমাদের কোনো তৎপরতা থাকে না। সন্তান যখন বুঝতে পারবে যে আপনারা তাদের ধোঁকা দিচ্ছেন তখন তারাও এই ব্যাপারটি নিজেদের মধ্যে লালন করবে। তখন তারাও আপনাদেরকে ধোঁকা দেওয়া শুরু করবে।

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوْا بِالْعُقُودِ

“হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের ওয়াদাগুলি পূর্ণ করো।” [সুরা মায়িদা, আয়াত: ০১]

সন্তানদেরকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে অবশ্যই তা পালন করুন। পিছিয়ে যাবেন না বা তাদেরকে ভুলভাল বুঝিয়ে প্রতিশ্রুতি পালনে ধামাচাপা দেবেন না। এতে করে সন্তানের মনে নেতিবাচক শিক্ষাই তৈরি হবে। যদি মনে করেন প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারবেন না অথবা সম্ভব নাও হতে পারে তাহলে শুধু শুধু তাদেরকে মিথ্যা স্বপ্নে বিভোর করে রাখবেন না। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি কচি মনে দারুণভাবে দাগ কাটতে পারে। বরং তাদের কাছে এমন সব প্রতিশ্রুতি দিন, যেগুলো পালন করতে পারবেন এবং অবশ্যই তা পরে পালন করুন। সন্তানরাও প্রতিশ্রুতি পালনে সচেষ্ট হবে। হাদিসে এসেছে, মুনাফিকের চারটি বৈশিষ্ট্য; যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে তা পালন করে না বা ভঙ্গ করে, আমানতের খেয়ানত করে এবং ঝগড়া করলে গালমন্দ করে। সন্তানদেরকে মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য বোঝাতে হবে। মুনাফিকের পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট একটি স্থান। সন্তানদেরকে এর মর্ম ভালোভাবে বোঝাতে হবে এবং নিজেদেরকে যেন তারা মুনাফিকের বৈশিষ্ট্যে পরিচিত না করে তার প্রতি পিতামাতাকে সচেষ্ট হতে হবে।

উদাহরণ: আপনার সন্তান সালাত আদায়ে গাফলতি করছে। আপনি তাকে ওয়াক্তমতো সালাত আদায়ের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করলেন। এক মাস পর্যন্ত দেখা গেল আপনার সন্তান ঠিকভাবে ওয়াক্তমতো সালাত আদায় করল। যখন সে আপনার কছে পুরস্কার চাইতে এলো তখন

তাকে ভুলভাল বুঝিয়ে বললেন—আরও এক মাস পর দেখব তারপরে দেবো। এভাবে আরও টালবাহানা করে প্রতিশ্রুতি পালনে অনীহা প্রকাশ করলেন। আপনার এই আচরণ সন্তানের ওপর দারুণভাবে প্রভাব ফেলবে। সেও ধোঁকা দিতে শিখে যাবে এবং প্রতিশ্রুতি পালনে সচেষ্ট হবে না।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَٰبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَ كَانَ رَسُوْلًا نَبِيًّا

"এই কিতাবে ইসমাইলের কথা বর্ণনা করো, সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং সে ছিল রাসুল, নবি।" [সুরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৪]

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْلَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ

"(তারাই সফল) যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।" [সুরা আল মুমিনুন, আয়াত: ০৮]

হাদিস শরিফে এসেছে, একবার রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এক সাহাবি এক বাচ্চাকে ডাকতে চাচ্ছিল আর ওই বাচ্চা তার কাছে আসতে অস্বীকার করছিল। ওই সাহাবি বাচ্চাটিকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বললেন, 'আসো ছেলে। আমাদের কাছে এসো। আমরা তোমাকে একটি জিনিস দেবো।' তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা শুনলেন ও বললেন, 'আচ্ছা! বাস্তবেই তুমি তাকে বস্তুটি দেওয়ার ইচ্ছা করেছ, নাকি এমনই তার মন ভোলোনোর জন্য তাকে এ কথা বলেছ?' সাহাবি বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার কাছে এক মুষ্টি খেজুর ছিল আর আমার ইচ্ছা ছিল, তাকে ডেকে আনা, খেজুর দেওয়ার ইচ্ছা না।' নবিজি তাকে বললেন, 'তাকে কিছু দেওয়ার কথা বলে ডেকে এনে না দেওয়া, এটা তোমাদের তরফ থেকে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হবে।' [সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং - ৪৩৩৯]**[২৪]

❖ বাচ্চাদের তাদের অনুভূতি প্রকাশ এবং আনন্দ-বেদনা ভাগাভাগি করার সুযোগ দিন

আপনার সন্তান তাদেরকে আপনার কাছে যত মেলে ধরতে পারবে ততই আপনি তাদের মানসিকতা বুঝতে পারবেন। সন্তানের সাথে এমনভাবে সম্পর্ক তৈরি করুন, যাতে করে তারা তাদের অনুভূতিগুলো আপনাদের কাছে ভাগাভাগি করে নিতে পারে। অনেক বাবা-মা সন্তানের কথাকে গ্রাহ্য করেন না। হয়তো ভাবেন অহেতুক কথা বলছে, বুঝে না বুঝে এলোমেলো কথা বলছে, তাই তাদের কথায় মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আপনি জানেন কি, আপনার বাচ্চা বড়দের মতোই জটিল বিষয় অনুভব করতে পারে। তারাও হতাশ হয়, উত্তেজিত হয়, দুঃখ পায়, রাগ করে, আতঙ্কিত হয়, চিন্তিত হয় এবং বিব্রতবোধ করে। কিন্তু অল্প বয়সে বাচ্চারা এই অনুভূতিগুলো প্রকাশ করার জন্য হয়তো সঠিক শব্দ ব্যবহার করতে পারে না; কিন্তু বুঝতে পারে ঠিকই। আপনি যদি তাকে বুঝতে চেষ্টা না করেন এবং তার অনুভূতিগুলো প্রকাশ করার সুযোগ না দেন, তাহলে এগুলো তার ভেতর থেকে যাবে এবং সে পরবর্তী সময়ে নিজেকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হবে। শিশুর উন্নত মানসিকতার বিকাশ ঘটাতে, নিজেদেরকে মেলে ধরতে, শারীরিক-মানসিক সমস্যা তুলে ধরতে তাদের সাথে কথা বলুন। ছোটোবেলা থেকেই তাদের ভেতরে এমন বিশ্বাস স্থাপন করে দিন, যাতে করে আপনার সন্তান বুঝতে পারে যে তাদের কথা, কাজ, অনুভূতি সবকিছুই আপনাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। বাচ্চারা তাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে মুখের ভাবের মাধ্যমে, তাদের শরীর, আচরণ এবং খেলার মাধ্যমে। শিশুদের কথায় বিরক্ত হবেন না বরং তাদেরকে প্রাণখুলে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে দিন। এবং তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং প্রতিক্রিয়া জানান। পিতামাতা হিসেবে বাচ্চাদের অনুভূতি এবং আচরণ বুঝতে এ ব্যাপারটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যত তাদের বুঝতে পারবেন ততই তাদের অনুভূতিগুলো ইতিবাচক এবং গঠনমূলক উপায়ে পরিচালনা করতে পারবেন।

উদাহরণ: আপনি আপনার মেয়েকে নিয়ে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গেলেন। সবার সাথে আপনাদের ভালো সময় কেটেছে এবং যখন বাড়ি আসছেন তখন আপনার ছোট্ট মেয়ে এলোমেলো করে হয়তো অনেক কথাই বলছে কিন্তু আপনি সেগুলো শুনেও না শোনার ভান করছেন এবং নিজের কাজ করছেন। আপনার মেয়ে যখন বুঝতে পারবে আপনি তার কথায় গুরুত্ব দিচ্ছেন না, তখন সে তার অনুভূতি প্রকাশ করতে ব্যাহত হবে, যা তার মনে চাপা পড়ে যাবে। বাচ্চারা যদি নিজেকে এভাবে গুটিয়ে নেয় তাহলে ভবিষ্যতে অনেক কঠিন

পরিস্থিতির হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না এবং তারা নিজেরাও নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

আপনি যখন দেখবেন, আস্তে আস্তে আপনার বাচ্চা উপযুক্ত উপায়ে তাদের অনুভূতিগুলো প্রকাশ করতে পারছে তখন তার প্রশংসা করুন। এর ফলে সে নিজেকে আরও মেলে ধরতে উৎসাহিত হবে। আর আপনিও তাকে অনুভূতিগুলো মোকাবিলা করতে বিভিন্ন উপায় শেখাতে পারবেন। বাচ্চাদের কেবল তাদের নিজস্ব অনুভূতি প্রকাশ করা নয় বরং অন্যের অনুভূতি এবং প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করতে উৎসাহিত করুন। তাদের সমস্যাগুলো গঠনমূলক সমাধান করার চেষ্টা করুন এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করার জন্য সময় দিন।

উদাহরণ: আপনার ছেলে হয়তো স্কুল থেকে ফিরে আপনাকে বলছে, সে আর স্কুলে যেতে চায় না, কারণ কেউ তার পাশে বসতে চায় না এবং শিক্ষকরাও তাকে তেমন পছন্দ করেন না। বাচ্চাকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দেবেন না, বরং তাকে জিজ্ঞেস করুন, কেন কেউ তাকে পছন্দ করে না? সে কি টিচারের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে না? সে কি অন্য বাচ্চাদের সাথে গন্ডগোল করে? আপনার বাচ্চা যখন সমস্যাগুলো বুঝতে পারবে তখন তার মাধ্যমেই সমাধানগুলো ধরিয়ে দিন। আপনার বাচ্চা নিজেই যেন একে একে তার নেতিবাচক আচরণগুলোকে ইতিবাচক আচরণে ফুটিয়ে তুলতে পারে সে বিষয়ে তাকে উৎসাহ দিন।**[২৫]

❖ ভালোবাসার শিক্ষা

বেশ কয়েকদিন আগে স্কুল থেকে ফেরার পথে নাকীবের এক ক্লাসফ্রেন্ড ড্রাভিদও তাদের সঙ্গে হাঁটছিল। হাঁটতে হাঁটতে নাকিবের মা ওদের সঙ্গে নানান বিষয়ে কথা বলছিলাম। একসময় নাকীব বলল, ওর মামা ওকে নতুন খেলনা কিনে দিয়েছে। খেলনাটির মূল্য কত, জানতে চাইল ড্রাভিদ। নাকীব মূল্য বলার পর ড্রাভিদ বলল, আমার কাছে ২৯ ইউরো আছে। আর ১৬ ইউরো জমালে আমিও তোমার খেলনাটি কিনতে পারব। কিন্তু আমি কিনব না। ১৮ তারিখে বিশেষ উপলক্ষ্যে আমার মাম্মাকে উপহার কিনে দেওয়ার জন্য আমি দুই মাস ধরে ইউরো জমাচ্ছি। মাকে উপহার কিনে দেওয়ার জন্য টাকা জমাচ্ছে শুনেই নাকিবের মায়ের মনটা কেমন এক মুগ্ধতায় ভরে গেল। মনে পড়ল নিজের টাকা দিয়ে যেদিন প্রথম মামণি আর বাবাকে উপহার কিনে দিয়েছিলাম, সেই দিনের কথা।

স্মৃতিটা নাকীবের সাথে শেয়ার করার জন্য ওর দিকে তাকাতেই সে হড়বড় করে বলতে শুরু করল, আম্মু, আমিও কিন্তু তোমাকে সবসময় ভালোবাসা উপহার দিই। ভালোবাসা সবচেয়ে সুন্দর উপহার। ভালোবাসা অমূল্য, তাই এটাকে অর্থের বিনিময়ে কেনা যায় না।

নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে ফিক করে হেসে ফেললেন মা। নাকীব একটু মুখ কালো করে বলল, তুমিই তো বলেছিলে, 'কাউকে দেওয়ার জন্য ভালোবাসার চেয়ে সুন্দর কোনো উপহার নেই। যারা আপনজন, তাদেরকে সবসময় অনেক অনেক ভালোবাসা দাও।' তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, অবশ্যই বাবা, ভালোবাসার চেয়ে সুন্দর, পবিত্র ও অনন্য কোনো উপহার পৃথিবীতে নেই। তোমার ভালোবাসা উপহারস্বরূপ পেয়ে সবসময় অনেক অনেক খুশি হই, আলহামদুলিল্লাহ।

বেশ কয়েক বছর আগে ছাত্রজীবনের এক বান্ধবী একজনকে পছন্দ করে নিজ পরিবার-পরিজন ছেড়ে তার হাত ধরে চলে গিয়েছিল। তাদের ছিল ভালোবাসাময় জীবন গড়ার মধুর স্বপ্ন। কিন্তু সেই মানুষটি তাকে জীবন ধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় বিলাসসামগ্রী দিতে ব্যর্থ হচ্ছিল। যদিও তারা তখন ভালোবাসার মাধ্যমে নিজেদের অর্থসংকট কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছিল। কয়েক মাস যেতে না-যেতেই বান্ধবী তার ভালোবাসার মানুষটির দেওয়া ভালোবাসার আতিশয্যে হাঁপিয়ে উঠল। সংসারে ছোট ছোট চাওয়া-পাওয়াকে ঘিরেও তুমুল দ্বন্দ্ব-কলহ শুরু হলো।

যে ভালোবাসার জন্য সে পরিবার ছেড়েছিল, সেই ভালোবাসাতেই অতিষ্ঠ হয়ে সংসার ভেঙে ফিরে এলো। এই ঘটনা দেখে আমি গভীর চিন্তায় নিমজ্জিত হলাম। বারবার মনে প্রশ্ন জাগছিল, ভালোবাসার জন্য পরিবারকে ছেড়ে দেওয়ার মতো ত্যাগ স্বীকার করতে পারলেও নিজের ছোট ছোট চাহিদাকে কেন সে ত্যাগ করতে পারল না? সমস্যাটা কোথায়? ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করলে তিনি হেসে বললেন, সমস্যাটা হচ্ছে শাড়ি-গহনা ইত্যাদিও মেয়েদের কাছে ভালোবাসার উপকরণ। উত্তরে বললাম, আমি এমনটা মনে করি না। ভাইয়া বললেন, কারণ তোমাকে এমনটা মনে করার শিক্ষা দেওয়া হয়নি। তোমাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, 'সংসারে ভালোবাসাই সত্য, সুখের জন্য ভালোবাসার বিকল্প নেই।' খুব হেসেছিলাম তখন। আসলেই তো! এই শিক্ষাটাই দেওয়া হয়েছে আমাদের সব ভাই-বোনকে। মামণি, বাবা, ভাইয়া, প্রিয়তম জীবনসঙ্গী থেকে শুরু করে পরিবারের সবাই কবে আমাকে কী উপহার দিয়েছে, মনে করতে হলে যথেষ্ট সময় নিয়ে ভাবতে হবে। কারণ ওসব উপহার আমার কাছে কখনোই তাদের ভালোবাসার তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কিন্তু তাদের দেওয়া সুন্দর সুন্দর ভালোবাসাময় মুহূর্তগুলো আমি অনবরত বলে বা লিখে যেতে পারব। কারণ আপনজনদের ভালোবাসা আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ।

জীবনে ভালোবাসার প্রয়োজনীয়তা আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারি না। ভালোবাসা মনে এমন এক আশার জন্ম দেয়, যা মানুষকে সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখতে শেখায়। জীবনে ভালোবাসার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা জানি, তবুও কেন যেন ঠিক গুরুত্ব দিতে পারি না। আমরা কারও জন্য 'ভালোবাসি ভালোবাসি' বলে জীবন দিয়ে দিই, অথচ সেই ভালোবাসার মানুষটি যদি অর্থকড়ির বদলে শুধু ভালোবাসা নিয়ে কাছে আসে, আমাদের মুখ কালো হয়ে যায়। কারণ বেড়ে ওঠার পরিবেশ থেকে আসলে আমরা শুধু ভালোবাসা পেয়েই সুখী বা তৃপ্ত হতে শিখি না। আমরা ভালোবাসাকে মূল্যায়ন করতে শিখি অর্থের অনুপাতে। যে যত বেশি দামি উপহার দিতে পারে, সে আমাদের কাছে তত বেশি গুরুত্ব ও ভালোবাসার দাবিদার হিসেবে গণ্য হয়। এর প্রভাব গিয়ে পড়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে। জীবনকে ঘিরে ঘূর্ণায়মান প্রতিটি সম্পর্কের ওপর। আর এজন্যই ছোটবেলা থেকে শিশুদেরকে অর্থকড়ি বা বৈষয়িক সম্পত্তির লোভ জাগিয়ে গড়ে না তুলে ভালোবাসা ও মূল্যায়ন করা শেখানো উচিত। আমরা যদি বলি, 'লেখাপড়া করে যে, গাড়ি-ঘোড়ায় চড়ে সে'-বাচ্চার মনে এতে এক কুৎসিত কল্পচিত্র তৈরি হবে। গাড়ি-ঘোড়াকেই সে জীবনের সফলতা বুঝে নেবে। সমাজের সাধারণ মানুষদের নীচ মনে করতে থাকবে। এর বদলে যদি আমরা তাকে শেখাই, 'লেখাপড়া করেন যিনি, ভালোবাসা পান তিনি'-কথাটায় তখন ব্যাবহারিক ভুল যেমন থাকে না, এ থেকে শিশুর

মন বিরূপ চিত্র নিয়েও বেড়ে ওঠে না। এগুলো এজন্যই শেখাতে হবে, যেন সে জীবনে চলার পথে মানুষকে বিবেচনা করে তার ভালোবাসা দিয়ে। কাউকে দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং নিজে পাওয়ার ক্ষেত্রেও।**[২৬]

❖ গোল্ডেন ওয়ার্ড-লাভ ইউ

আজকাল প্রায়ই একজন আমার মেঘে ঢাকা গুমোট মনে রোদেলা দুপুর হয়ে হাজির হয়। আবার কখনো বা মরুময় শুষ্ক প্রাণকে অঝোর শ্রাবণ হয়ে চঞ্চল করে দেয়। হয়তো কোনো কারণে আমার প্রচন্ড মন খারাপ। সে পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলবে, তুমি জানো, কী হয়েছে? আধঘণ্টার ওপর হয়েছে, আমি তোমার মুখে হাসি দেখি না। প্লিজ একটু হাসি দাও। আবার হয়তো মনে খানিকটা একাকিত্ব ভর করেছিল, পাশে এসে বলবে, কতক্ষণ হয় তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করো না! জড়িয়ে ধরার সাথে সাথে মুখ দিয়ে প্রশান্তির বুলি ফুটিয়ে বলবে, এবার আমাকে আদর দাও। আলহামদুলিল্লাহ, অদ্ভুত এক মোহনীয় প্রাপ্তিতে মনটা ভরে ওঠে। না চাইতেও হাসি ফুটে ওঠে ঠোঁটের কোণে, চোখ ভিজে যায় আনন্দাশ্রুতে।

ছয় মাস আগেও উঠতে, বসতে, শুতে, জাগতে নাকীব লাভ ইউ, লাভ ইউ করত। কিন্তু আজকাল সে মুখে বলার পরিবর্তে আচরণ দিয়ে ভালোবাসা প্রকাশ করাটা দারুণভাবে রপ্ত করে নিয়েছে। কয়েকদিন আগে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো আমার কাছে। এই স্টাইলে সাধারণত দুর্বুদ্ধি শেয়ার করার জন্যই আসে। তাই বললাম, আবার কী? সে বলল, কিছু না তো আম্মু, তোমাকে 'ঝাপ্পি' দিতে এসেছি। বলেই দুষ্টু-মিষ্টি হাসিভরা মুখে আমাকে কিছুক্ষণ জড়িয়ে ধরে রেখে লাফাতে লাফাতে চলে গেল। সেদিন সকালে অনেক কাজ করতে হয়েছিল। ক্লান্ত ছিলাম খুব বেশি। কিন্তু রান্না করা হয়ে ওঠেনি তখনো। নাকীবের ওই ছোট্ট ভালোবাসার প্রকাশটুকু আমার মুখে এমন হাসি নিয়ে এসেছিল, সমস্ত ক্লান্তি এমনভাবে দূর করে দিয়েছিল, উঠে আমি স্বাচ্ছন্দ্যে পাকের ঘরে চলে গেলাম। আলহামদুলিল্লাহ।

নাকীবের যখন তিন বছর বয়স, একদিন ঘুমের মধ্যে ওর গায়ের কম্বল ঠিক করে আদর দিয়ে উঠে আসছিলাম, ঘুমজড়ানো কণ্ঠে বলে উঠল, আম্মু, আই লাভ ইউ। ওই মুহূর্তের অনুভূতিকে শব্দে প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই। অন্যরকম এক প্রাপ্তিতে মনটা এমন ভরপুর হয়ে গিয়েছিল, আজও আমি তা অনুভব করি। এরপর থেকে অসংখ্যবার এমনটা হয়েছে। এখনো নাকীব গভীর ঘুমের ঘোরে ওর পাশে আমার অস্তিত্ব কীভাবে যেন টের পেয়ে যায়। তখন ঘুমজড়ানো কণ্ঠে শোনা তার 'লাভ ইউ' আমার চোখে বর্ষা নামিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে বোঝার চেষ্টা করি, ওই ছোট্ট প্রাণটা তার আম্মুকে কতটা ভালোবাসে, যার প্রকাশ অবচেতনেও করতে থাকে! যখন নাকীব স্কুলে থাকে কিংবা আমি দূরে কোথাও থাকি, তার

এসব ভালোবাসার সুখ আমার মনে ক্ষণে ক্ষণে দোলা দিয়ে যায়। তার জন্য খুব মায়া হতে থাকে তখন।

এভাবে শিশুকে ভালোবাসা-মমতা-মানবিকতা শেখানোর প্রথম ফল বাবা-মায়েরাই ভোগ করে থাকে। একটি শিশু যত আদর পাবে, ভালোবাসা পাবে; যত মানবিকতা বুঝবে, সম্পর্ক শিখবে, তার ভেতর আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে সবার প্রতি কোমলতা, হৃদ্যতা, সহমর্মিতা তত বেশি তৈরি হবে। সে সবাইকে ভালোবাসতে শিখবে। অন্যের দুঃখে ব্যথিত হবে। আর এটি অন্যদের মনেও তার প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে তুলবে।

অনেকেই আছেন, মুখ ফুটে 'ভালোবাসি' বলতে পারেন না। অথচ 'লাভ ইউ' বা 'ভালোবাসি' খুব ছোট্ট একটা উচ্চারণ, কিন্তু এর অনুভূতি আকাশছোঁয়া। হাদিসেও এসেছে, 'তোমরা কাউকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসলে, তা মুখে প্রকাশ করো। এতে তোমাদের মহব্বত আরও বৃদ্ধি পাবে।' [আজ যুহদ, ওয়াকি, আল্লাহর জন্য ভালোবাসা অধ্যায়, হাদিস নং : ৩৩৭ : হাদিসটি হাসান]
তাই যাদেরকে 'ভালোবাসি' বলতে শরিয়তে কোনো বাধা নেই-আমাদের সেই আপনজন, প্রিয়জন ও কাছের মানুষদের বারবার জানিয়ে দেওয়া উচিত, তাদেরকে আমরা ভালোবাসি।

কারণে-অকারণে অভিযোগ, অনুযোগ তো কতই করি, কারণে-অকারণে একটু 'ভালোবাসি, ভালোবাসি'-ও না হয় করলাম!**[২৭]

❖ গোল্ডেন ওয়ার্ড—থ্যাংক ইউ

'সম্পর্ককে যদি সর্বদা আবাদ রাখতে চাও, কারণে-অকারণে বারবার ধন্যবাদ দাও।' ধন্যবাদ কাকে বলে, কত প্রকার ও কী কী? সেটা উদাহরণ-সহ বিয়ের পর জেনেছিলাম। প্রতিটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র কাজের জন্য প্রিয়তমকে হাসিমুখে আন্তরিকতার সঙ্গে 'জাযাকিল্লাহ' বলতে দেখে প্রথম প্রথম বেশ অবাক হতাম। মনে হতো, এখানে ধন্যবাদ জানানোর কী আছে? ঘর গোছানো, রান্না করা, চা-কফি দেওয়া, বাগানে পানি দেওয়া, ফুলদানির ফুল পরিবর্তন করা, পরিবারের খোঁজখবর রাখা-ইত্যাদি তো সংসারের নিত্যদিনের কাজ। সবাই করে। প্রতিটা কাজের জন্য এমন আলাদা আলাদা ধন্যবাদ দেওয়ার কী দরকার? আবার নিজেকে ফিট রাখা, পড়াশোনার রুটিন ঠিক রাখা, সময়মতো সালাত আদায় করা, কুরআন-হাদিস অধ্যয়ন করা-এসব তো আমি আমার নিজের কল্যাণের জন্যই করি।

এসব কাজের জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানানো কেন জরুরি? অবশ্য এটাও ঠিক, তিনি যখন প্রতিটি কাজের জন্য আলাদা করে ধন্যবাদ বলতেন, ভীষণ ভালো লাগত। এর চেয়েও বেশি ভালো লাগত, যখন কোনো ব্যাপারে আমি সরি বা থ্যাংক ইউ বললে সেটার জন্য উলটো আমাকে আবার থ্যাংক ইউ বলতেন। হয়তো আমার রাগ করার মতো কোনো ঘটনা ঘটেছিল; কিন্তু আমি রাগ করিনি কিংবা তিনি একটা জিনিস বোঝাচ্ছিলেন এবং আমি চুপচাপ মেনে নিচ্ছিলাম, সেজন্যও ধন্যবাদ জানাতেন। একদিন অদ্ভুত একটা কান্ড করে নিজেই আবার গোঁ ধরে বসে ছিলাম। আমারই ভুল হয়েছে-এই আত্মোপলব্ধি হওয়ার পর যখন সরি বললাম, হাসিমুখে বললেন, নিজের ভুলটা মেনে নিয়ে এত সহজ ও সুন্দরভাবে সরি বলতে পারার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ বলাতে আরেকজন ওস্তাদ বাক্তি হচ্ছেন আমাদের নাকীব মিয়া। যেমন:
আম্মু, আজকের নাস্তাটা একটু বেশি মজা হয়েছে, গ্রাসিয়াস। তুমি অসুস্থ, তাও আমাকে স্কুল থেকে নিতে এসেছ? জাযাকিল্লাহ। দুষ্টু কাজ করার জন্য আমাকে বকে না দেওয়ার জন্য শুকরিয়া। আম্মু, তুমি কত কষ্ট করে রান্না করো, আবার আমাকে বেড়েও খাওয়াও, থ্যাংক ইউ। এক গ্লাস পানি ভরে সামনে রাখলেও নাকীব আনন্দিত কণ্ঠে শুকরিয়া জানায়। আমার কাজ বন্ধ রেখে ওর সাথে বসে ওর মতো করে খেললে গদগদ কণ্ঠে থ্যাংক ইউ বলে। ওকে যে ঘুম পাড়িয়ে দিই, সেজন্যও শুকরিয়া আদায় করে। আপনজনদের এমন ছোট্ট ছোট্ট মূল্যায়ন খুব বেশি ভালো লাগে।

নাকীবের স্কুলবন্ধুকে একদিন আইসক্রিম বানিয়ে খাইয়েছিলাম। স্কুল থেকে ফেরার পথে বাচ্চার সাথে দেখা হলেই সে আমাকে বলে, গ্রাসিয়াস আফরোজা। তোমার আইসক্রিমটা অনেক টেস্টি ছিল। এরপর আমি যতবার আইসক্রিম বানিয়েছি, বাচ্চাটাকে বাসায় ইনভাইট করেছি। বেশ বয়স্ক এক বোন বেড়াতে এসেছেন। তিনি শুঁটকি পছন্দ করেন জেনে রান্না করলাম। 'অনেক দিন পর এত্ত মজা করে এতগুলো ভাত খেয়েছি'-এই বাক্যটা কম করে হলেও দশবার বলেছেন। ফোনে যখনই কথা হয়, এই ব্যাপারটুকু স্মরণ করেন। এরপর আমি যতবার শুঁটকি রান্না করেছি, হয় তাকে বাসায় আসতে বলেছি, না হয় তার বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছি। আসলে মূল্যায়ন যেকোনো কাজের স্পৃহা বাড়িয়ে দেয়। যারা মূল্যায়ন করতে পারেন, তাদের জন্য শত কঠিন কাজ করতেও কোনো কষ্টবোধ হয় না; বরং মনে একটা সুখাবেশ তৈরি হয়।

সরি আর লাভ ইউ-এর মতো উন্মুক্ত মনে থ্যাংক ইউ বলতে পারা মানুষের সংখ্যাও আমাদের সমাজে যথেষ্ট কম। অনেককেই আবার বলতে দেখেছি, পরিবারের সদস্য কিংবা বন্ধুত্বের মাঝে নো থ্যাংকস, নো সরি। সরি আর থ্যাংক ইউ বলাটাকে তারা ফর্মালিটি মনে করেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, কিছু কিছু ফর্মালিটি সম্পর্কের বন্ধনে ভালোলাগা ও আকর্ষণ বৃদ্ধির পসিবিলিটি অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়।

আর এই শব্দগুলো বাচ্চাদের শেখানোর সহজ পদ্ধতি হলো, নিজেরা আমল করা। নাকীব তার আব্বুর মুখে 'জাযাকিল্লাহ', 'শুকরিয়া', 'ধন্যবাদ', 'থ্যাংক ইউ' ইত্যাদি শুনে শুনেই রপ্ত করেছে। এগুলো তাকে বই থেকে পড়ানো হয়নি। আমাদের মনে রাখতে হবে, আচরণের সৌন্দর্য অনুশীলনের মধ্য দিয়ে অভ্যাসে পরিণত করতে হয়। বইতে এগুলো পাওয়া যায় শব্দ হিসেবে, গল্প হিসেবে, উপদেশ হিসেবে-কিন্তু নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করতে হয় আমলের মাধ্যমে। বড়রা নিয়মিত আমল করলে ছোটদের আর বলতে হয় না, শুনতে শুনতেই তারা শিখে যায়।**[২৮]

❖ গোল্ডেন ওয়ার্ড—সরি

বেশ কিছুদিন ধরে নতুন এক ক্লায়েন্টের সাথে কথা হচ্ছে। ২৪ বছর বয়স মেয়েটির। বিয়ে হয়েছে দেড় বছর আগে। হাজবেন্ডের সাথে কোনোভাবেই অ্যাডজাস্ট হতে পারছে না। তাই সে ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু তার বাবা-মা আর ভাই এই সিদ্ধান্তের সাথে একমত হতে পারছেন না। তাই তারা মেয়েটিকে কাউন্সিলিং-এর জন্য এখানে নিয়ে এসেছেন। বিয়ের একদম প্রথম দিন থেকে নিয়ে দেড় বছরের সমস্ত ইস্যুতে যে বিষয়টা কমন মনে হয়েছে, তা হলো সরি বলতে না পারা। এমনকি নিজের ভুল বুঝতে পারার পরও সরি বলতে সংকোচ বোধ করা। দেশে হোক বা দেশের বাইরে, নিজ পরিবারের বাইরে যে কয়েকটি বাঙালি পরিবারকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে, তাদের মধ্যে কমন বিষয়গুলোর অন্যতম পেয়েছি এই সরি বলতে না পারা।

আমাদেরকে কিছু ম্যাজিক ওয়ার্ড শেখানো হয়েছিল, যে ওয়ার্ডগুলোর যথাযথ প্রয়োগ জীবনকে সহজ, সুন্দর ও আনন্দময় করে তোলে। সেসবের মধ্যে একটি ছিল 'সরি'। স্প্যানিশে সরিকে বলা হয় 'লো সিয়েন্তো'। আমাদের এক প্রফেসর বলেছিলেন, 'সিয়েন্তো' মানে ফিল করা। অর্থাৎ কাউকে সরি বলার আগে ভালোমতো ফিল করে নেওয়া জরুরি। কিন্তু সরি বলার আগে চিন্তা-গবেষণা করা অপ্রয়োজনীয়। যখনই মনে হবে, সরি বলা উচিত, বলে দেবে। আমাদের এখানের স্কুলগুলোতেও সরি বলাটা একদম প্রি-তে থাকতেই বাচ্চাদের আয়ত্ত করানো হয়।

নাকীব জন্মানোর সময় আমার ফিজিক্যাল কিছু সমস্যা হয়েছিল। একদিন প্রসঙ্গক্রমে এক বোনকে সমস্যার কথাগুলো বলার সময় সে শুনে ফেলেছিল। এরপর থেকে আমি অসুস্থ হলেই কোলের ভেতর এসে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলে, আম্মু, আমি সরি। আমার জন্য তোমার এত কষ্ট হচ্ছে। সত্যি আমি সরি আম্মু। ওকে অনেক বুঝিয়েও কাজ হচ্ছে না। যখন বলি, তখন চুপ থাকে। কিন্তু আবার আমাকে অসুখ দেখলেই টেনে টেনে নাকিসুরে 'সরিইহই, সরিইইই' বলতে থাকে।

আমাদেরকে দেওয়া প্রতিটা গোল্ডেন টিপসের সাথে বিভিন্ন ক্যাপশন ছিল। যেমন, 'সরি খুব ছোট একটি শব্দ; কিন্তু জটিল সমস্যাও তার কাছে হয় জব্দ।' সত্যিই তাই। জীবনে অসংখ্যবার 'সরি' শব্দের ম্যাজিকে নিজের এবং অন্যের জ্বলজ্বলে সমস্যাকে নিভে যেতে দেখেছি। যা-ই

হোক, মেয়েটার প্রসঙ্গে ফিরে যাই। গতকালও প্রায় আধা ঘন্টার মতো নানা উদাহরণের মাধ্যমে ওকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু যে গাছের বীজই বোনা হয়নি মনের ভেতর, তার ফুল কীভাবে সুবাসিত করবে জীবনকে।

জীবনকে সহজবোধ্য করে তোলার গোল্ডেন টিপসগুলো আসলে বীজের মতো। কচি মনের মাটিতে বোনা না হলে তার ছায়ায় নিজের যেমন বসার সুযোগ হয় না, তেমনই সে অন্যদের জন্যও প্রশান্তিকর আশ্রয় হয়ে উঠতে পারে না। এজন্য বাচ্চাদের এগুলো তো শেখাতে হবে, এগুলোর আদলে গড়ে তুলতেও হবে। ছোট বয়সেই যদি কেউ নিজের ভুলের জন্য সরি বলা শিখে যায় এবং এই 'সরি' তাকে দ্বিতীয়বার সেই ভুল করতে বারণ করে, তাহলে বড় হলে এই অনুশীলন তাকে অভিনব ব্যক্তিত্বে পরিণত করবে। তার বিনয় ও উত্তম গুণাবলি চারদিকে সৌন্দর্য ছড়াবে।**[২৯]

❖ শিশুদের গড়ে তোলা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। [সুরা তাহরিম, আয়াত : ৬]

কুরআনের এই আয়াত সর্বকালের সমস্ত মানুষের জন্য প্রযোজ্য। আমরা সবাই জানি, আমাদের ঘরগুলোকে দ্বীনের দুর্গ না বানালে ভবিষ্যৎ-প্রজন্মকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

সন্তানসন্ততি আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য নিয়ামত এবং সেইসাথে আল্লাহপাকের আমানত। তাই আপনাকে সারা জীবন ধরে এই আমানতের রক্ষণাবেগুন করতে হবে। তাদেরকে এমন শিক্ষা দিন যেটা তাদের মনন এবং মানস গঠনে অত্যন্ত উজ্জ্বল ভূমিকা রাখবে। তাকে ছোটোবেলা থেকে আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে নিন। তাকে এমন পরিবেশে বড় করে তুলুন, যাতে করে ইসলামি জীবনাদর্শে তারা নিজেদেরকে সাজিয়ে তুলতে পারে। সন্তানদের এমন শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলতে হবে, যাতে সে আলাহর বিধান মেনে সিরাতে মুস্তাকিমের ওপর সহজে চলতে পারে। সন্তানদের উন্নত চরিত্র গঠন, ভদ্রতা ও শিষ্টাচার এবং ব্যাবহারিক জীবনে আমলের অভ্যাস তৈরি করতে দীক্ষাও দিতে হবে। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-'কেউ তার সন্তানকে আদব তথা শিষ্টাচার শিক্ষা দান করা এক সা (একটি পরিমাপ) শস্য আল্লাহর রাস্তায় সদকা করা থেকেও উত্তম। [সুনানুত তিরমিজি]

নবিজি আরও ইরশাদ করেন- 'কোনো পিতা তার সন্তানকে ভালো আদব তথা শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া থেকে উত্তম কোনো পুরস্কার দিতে পারে না।' [প্রাগুক্ত]

নবিজি আরও ইরশাদ করেন-'তোমরা নিজ সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে নামাজের নির্দেশ দান করো, দশ বছর বয়সে নামাজ না পড়লে শাস্তি দান করো এবং ঘুমানোর সময় তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।' [সুনানু আবি দাউদ]

শিশুদেরকে যদি ছোটবেলা থেকে ইসলামের আলোকে গড়ে তোলা হয়, তাহলে সাধারণত তারা জীবনে কখনো পথহারা হয় না। কারণ ইসলাম একটি সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থাপত্র-এতে

জীবনের সব ক্ষেত্রে সঠিক পথে চলার দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। তাই সন্তানকে যত্নসহকারে ইসলামি শিক্ষা দান করুন।

সাহাবা, তাবেয়ি থেকে বহু বর্ণনা রয়েছে যে, -বাবার দায়িত্ব এবং কর্তব্য হলো, সন্তানকে দ্বীন শেখানো, মন্দ কাজ ও মন্দ পরিবেশ একে দূরে রাখা। শুধু কি তাই? সন্তানের পরিণত বয়সে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করাও তাদের দায়িত্ব। যেন তারা কোনো পাপাচারে লিপ্ত না হয়ে যায়। অভিভাবকদের শিথিলতার কারণে সন্তান যদি কোনো গুনাহে জড়িয়ে পড়ে তবে এর জন্য দায়ী হবেন অভিভাবকগণ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যার সন্তান আছে, সে যেন তার সুন্দর নাম রাখে এবং তাকে উত্তম চরিত্র শেখায়। যখন সে বালেগ ব তখন তার বিয়ে দেয়। বালেগ হওয়ার পরও যদি বিয়ে না দেয় আর সে কোনো নাহ করে ফেলে তবে তার এ গুনাহ তার পিতার ওপর বর্তাবে। [শুআবুল ঈমান, বায়হাকি, খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪০১]

একটি শিশু যেন বড় হয়ে একজন আদর্শ মানুষ হতে পারে, তার জন্য দরকার শুধু-সঠিক অভিভাবকত্ব। একমাত্র সঠিক অভিভাবকত্বই পারে শিশুকে সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে সুখী, সুন্দর ও শরিয়তসম্মত জীবন দিতে। একটি শিশু নিজের বাবা-মাকে দেখে শেখে, তাদের অনুসরণ করে বড় হয়। সুতরাং বাবা-মায়ের জীবনযাত্রা যদি শরিয়তসম্মত হয়, তাহলে শিশুর জীবনও সেই প্রভাবে প্রভাবিত হয়।

একটি শিশুকে গড়ে তোলার জন্য তার জীবনের প্রথম পাঁচ-ছয় বছর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়টায় সে তার আয়না বা রোল মডেল-বাবা-মাকে দেখে দেখে আচার-আচরণ থেকে শুরু করে সবকিছু শিখতে থাকে। বলা হয়, একটি শিশু সিসি ক্যামেরার মতোই। সর্বক্ষণ বাবা-মাকে পর্যবেক্ষণ করে এবং পরে সেটাই নিজের আচরণে রূপান্তরিত করে। তাই বাবা-মা যদি চান তাদের সন্তান একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠুক, তাহলে শিশুদের সামনে নিজেদেরকে আদর্শ মানুষের ভূমিকা পালন করতে হবে।

সাধারণত একদম ছোট বয়স থেকে শিশুকে পরিকল্পনামাফিক কিছু শেখানো হয় না। কিন্তু এই বয়সেই শিশুরা সবচেয়ে বেশি শেখে —বাবা-মা তাদেরকে শেখাতে যান বা না চান— শিশুরা চারপাশের পরিবেশ ও তাদের সাথে করা অন্যদের আচরণ থেকে নিজেদের মতো করে অনেক কিছু শিখে ফেলে। এমনকি আশেপাশের মানুষদের পারস্পরিক সম্পর্ক থেকেও তারা অনেক কিছু নিজেদের মধ্যে রপ্ত করে নেয়। তাই বুদ্ধিমান অভিভাবক তারাই, যারা

একদম ছোটবেলা থেকে সন্তানকে গাড়ে তোলার ব্যাপারে নিজেদের আত্মনিয়োগ করেন। সন্তানকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাইলে বাবা-মায়ের প্রথম করণীয় হলো তাকে যথেষ্ট প্রয়োজনী আদর, ভালোবাসা, সময় ও মনোযোগ দেওয়া।

মানুষ স্বভাবগতভাবে সৃজনশীল হলেও সবাই সমান স্তরের সৃজনশীলতা ধারণ কর না। তবে চর্চার মাধ্যমে সৃজনশীলতার বিকাশ সম্ভব। মানুষের সৃজনশীলতার বিকাশ সবচেয়ে দ্রুত হয় শৈশবে। তবে এর জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা। তবে এর জন্য তাদেরকে নানাভাবে সহায়তা করতে হয়।

এক্ষেত্রে বাচ্চাদের সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য অনেক রকম কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। যেমন: ছড়া ও গল্প লেখা, নিজের সম্পর্কে এবং পরিবার সম্পর্কে লেখা, পরিবারের কারও ইন্টারভিউ নেওয়া, স্মরণীয় কোনো ঘটনা লেখা ইত্যাদি।

শিশুদের কল্পনার জগৎ অনেক বৈচিত্রত্র্যময়। আর কল্পনার মাধ্যমেই প্রতিভার একটি বড় অংশের স্ফুরণ ঘটে। শিশুরা কল্পনার পঙ্খিরাজ ঘোড়ায় চড়ে বিচরণ করে সুপ্পপুরীর দেশ থেকে দেশান্তরে। তাদের চোখজুড়ে থাকে দিগন্তজোড়া স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্নে পাখা জোড়া দেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু আমাদেরই। শিশুর চারপাশে যা কিছু আছে বা যা কিছু ঘটছে, সব বিষয়ে তাদের মনে ধারণার বীজ জন্মায় এবং সে অনুযায়ী বীজটির শাখাপ্রশাখা বিস্তার লাভ করতে থাকে। এটি একট স্বাভাবিক বা স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া। তাই শিশুর কল্পনার রাজ্য যেন সুশোভিত হয়, তার সৃজনশীলতা হতে পারে পরিপূর্ণ বিকশিত, সেই ব্যবস্থা আমাদের করে দিতে হবে।**[৩০]**

❖ নির্দেশনা, শিক্ষা, কৌশল

এটি সন্তানের নেতিবাচক আচরণ সংশোধন এবং পরিবর্তনের একটি প্রস্তাবিত ইসলামিক পদ্ধতি। এটি তিনটি পদক্ষেপ নিয়ে গঠিত:

১. নির্দেশনা : সন্তান যখন কোনো ভুল করে ফেলবে অথবা কারও সাথে কোনো অসম্মানজনক আচরণ করে ফেলবে তখন তাদেরকে এ ব্যাপারটি ধরিয়ে দিতে হবে। খুব শান্ত কিন্তু দৃঢ়ভাবে তাদেরকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে হবে—তারা যে কাজটা করেছে সেটা অন্যায়। সাথে সাথে এর প্রভাব কেমন হতে পারে, এগুলোও ভালোমতো বুঝিয়ে দিতে হবে। পিতামাতা হিসেবে এটি ইতিবাচক আচরণ। কখনোই সন্তানকে এসব ব্যাপারে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। তাদের সংশোধনের ব্যাপারটি যদি পিতামাতা এড়িয়ে যায়, তাহলে এটি তাদের নেতিবাচক আচরণ। সংশোধন করতে গিয়ে পিতামাতা অবশ্যই চিৎকার চেঁচামেচি করে, বাচ্চাকে সবার সামনে লজ্জা দিয়ে, অথবা তাদেরকে মারধর না করে। এর ফলে আপনার সন্তান বিগড়ে যেতে পারে। আপনাদের ভয়ে হয়তো বা সে সামনে এসব কাজ করবে না, তবে আড়ালে-আবডালে করতে সংকোচ বোধ করবে না।

২. শিক্ষা: শিশুরা যখন অসম্মানিত কোনো কাজ করে ফেলবে তখন তাদেরকে নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদাহরণ টেনে বোঝাতে হবে। তাদেরকে এ ব্যাপারে শিক্ষা দিতে হবে।

নবিজি বলছেন-

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوَقِّرُ كَبِيرَنَا
"যে বড়োদের সম্মান প্রদর্শন করে না, ছোটোদের স্নেহ করে না সে আমার উম্মত নয়।" [সুনানুত তিরমিজি, হাদিস : **১৯২১**]

যখন পিতামাতা হায়া বা লজ্জা সম্পর্কে বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দেবেন তখন কুরআনের এই আয়াত তাদেরকে বোঝাতে পারেন-

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْوَلُ

“যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। কান, চোখ, অন্তরওদের প্রত্যেকের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।” [সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ৩৬]

ধরুন, আপনি আপনার বাচ্চাকে নিয়ে পার্কে যাচ্ছেন। হঠাৎ করেই অশালীন কোন দৃশ্য চোখের সামনে চলে এলো। এ সময় বাচ্চাকে স্মরণ করিয়ে দিন যে, আমরা যা শুনছি, যা দেখছি সে ব্যাপারে আমাদেরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তা আল্লাহর ভয়ে যেন আমরা এ থেকে নিজেদেরকে সতর্ক রাখি। আপনাকে এই সময় যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে। এটা আপনার ইতিবাচক আচরণ। কিন্তু আপনি যদি ব্যাপারটাকে পাত্তা না দেন এবং সন্তান সেদিকে তাকিয়ে আছে সে ব্যাপারটা গুরুত্বের সাথে না দেখেন, তবে এটি আপনার নেতিবাচক আচরণ।

কুরআনের আয়াত এবং নবির শিক্ষাগুলোর ব্যবহার শিশুকে বুঝতে সহায়তা করে। আমরা যা-কিছু করি সবই আল্লাহর জন্য করি। যার কারণে এই আচরণগুলো পিতামাতা বাচ্চাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করে। অর্থাৎ পিতামাতা মনগড়া জীবনপদ্ধতি বাতলে দিচ্ছেন না বরং কুরআন এবং সুন্নাহের আলোকে বাচ্চাদের জীবন গড়ে তুলছেন। এক আচরণ বাচ্চাদের সঙ্গে পিতামাতার দ্বন্দ্ব এড়াতে সাহায্য করে।

৩. প্রশিক্ষণ: কুরআন এবং সুন্নাহের আলোকে বাচ্চাকে তার আচার-আচরণ, ব্যবহার, কথা বলার আদব ইত্যাদির প্রশিক্ষণ দিন। তবে এমনটা আশা করবেন না যে, একবার বাচ্চাদেরকে এগুলো দেখিয়ে দিলে বা মুখে বললে তারা সবসময় এমন আচরণ বজায় রাখবে। বরং বাচ্চাদেরকে হাতে-কলমে শেখান। কারণ, বাচ্চারা চোখ দিয়ে শোনে, কান দিয়ে নয়।

পিতামাতা হিসেবে এটি আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য। বাচ্চা ভুল করবে, এড়িয়ে যেতে চাইবে কিন্তু আপনাকে সে জায়গায় দৃঢ় থাকতে হবে। সন্তানকে ছাড় দেওয়া যাবে না। বারবার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। অনুশীলন নিখুঁত না হওয়া পর্যন্ত প্রক্রিয়া পুনরায়া করতে হবে।**[৩১]

❖ শিশুদের নিয়মানুবর্তিতা

মায়েরা যে অভিযোগটা সবচেয়ে বেশি করেন, তা হচ্ছে-বাচ্চারা কেউই নিয়ম মেনে চলতে চায় না। সারাক্ষণ যদি তাদের পেছনে লেগে থাকা হয়, তাহলে শুধু রুটিনের কাজটুকু আদায় করে, একটু বেখেয়াল হলেই তারা নিজেদের ইচ্ছেমতো চলতে শুরু করে দেয়। আসলে বেশিরভাগ বাবা-মা-ই ভুলে যান, শিশুরা হচ্ছে দুরন্তপনার প্রতীক। তাই যেকোনো নিয়ম বা অভ্যাসের আদলে তাদের গড়ে তুলতে চাইলে যথেষ্ট সময় নিতে হবে। আর তার চেয়েও বড় কথা হলো, শিশুদেরকে নিয়মানুবর্তিতা শেখাতে হলে আগে নিজেদেরকে নিয়ম মেনে চলতে হবে। কিন্তু সমস্যা হলো বাবা-মায়েরা সন্তানদের নিয়মানুবর্তী বানাতে যতটা আগ্রহী, নিজেরা নিয়ম মেনে চলতে ঠিক ততটাই উদাসীন।

শিশুরা অনুকরণপ্রিয়, তাই যেকোনো জিনিস বলার চেয়ে করে দেখালে তারা সেটা দ্রুত শিখে প্রয়োগ করে দেখাতে পারে। বিপরীতে যখন তাদেরকে একটা জিনিস করতে বলা হয় এবং তারা বাবা-মাকে ঠিক উলটোটা করতে দেখে, এর প্রচন্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে তাদের মনে। তারা তখন এটাও বুঝে উঠতে পারে না, কাজটা যেভাবে তাদেরকে করতে বলা হচ্ছে, সেভাবেই করা উচিত, না অন্য কোনোভাবে? আর যদি উচিত হয়, তাহলে বাবা-মা কেন করছেন না?

বাচ্চারা যেন নিজ থেকেই নিয়ম মেনে চলতে আগ্রহী হয়, সেজন্য ছোট ছোট কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে নিয়ম মেনে চলার জন্য উপহার দেওয়া। আমরা এমনই একটা রুটিন করতে পারি বাচ্চাদের জন্য, যে রুটিনে প্রতিটা কাজ ঠিকমতো করার জন্য পয়েন্ট আছে।

যেমন: স্কুল থেকে এসে নিজের ড্রেস, ব্যাগ সবকিছু জায়গামতো গুছিয়ে রাখার জন্য ২০, সময়মতো গোসল ও খাওয়ার জন্য ২০, হোমওয়ার্ক করার জন্য ২৫, কুরআন তিলাওয়াতের জন্য ২৫, প্রতিটা কাজ করার আগে নির্দিষ্ট দুআ পড়লে ৩০, বাসায় মেহমান এলে বা বাইরে পরিচিত কারও সাথে দেখা হলে সুন্দরভাবে সালাম ও কুশলাদি বিনিময়ের জন্য ২০, ডায়েরি লেখার জন্য ১০-এভাবে মোট ২০০ পয়েন্টের রুটিন।

সপ্তাহভিত্তিক রুটিনে প্রতি সপ্তাহের মোট পয়েন্ট হয় ১৪০০ (প্রয়োজনে পয়েন্ট কমবেশি হতে পারে)। যে কমপক্ষে ১২০০ পয়েন্ট তুলতে পারবে, তাকে ছোট্ট একটা উপহার দেওয়া হবে। আবার ঠিকমতো কাজ করার জন্য যেমন পয়েন্ট দেওয়া হয়, একইভাবে কোনো কাজ যথাযথ না করলে পয়েন্ট মাইনাসেরও ব্যবস্থা আছে। এছাড়া অকারণে কান্না করলে ৪০, স্কুল থেকে কমপ্লেইন এলে ৪০ এবং মুখে মুখে তর্ক করলে ৪০ পয়েন্ট মাইনাস করে দেওয়া হয়। তবে রুটিন মেনে চলার ক্ষেত্রে যেটা খেয়াল রাখতে হয়, সেটা হচ্ছে-শিশুরা যেন ব্যাপারটা উপভোগ করে। তাদের কাছে যেন এটাকে বোঝা মনে না হয়। আর একই রুটিন টানা ছয় মাসের অধিক শিশুদেরকে দিয়ে পালন করানো উচিত নয়।

মনে রাখতে হবে, এই রুটিনগুলো শুধু শিশুদেরকে নিয়মের মধ্যে আনতে উৎসাহিত করার জন্য। যখন শিশুরা মোটামুটি নিয়ম মেনে চলতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তখন এই রুটিন বন্ধ করে দিয়ে তাদের স্বাভাবিক রুটিন অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে।

শিশুদেরকে নিয়মের মধ্যে আনার সবচেয়ে ফলপ্রসূ মাধ্যম হচ্ছে বাবা-মায়ের নিয়মানুবর্তী জীবন। নিজেরা সময় ও নিয়মকে সম্মান না করে সন্তানের কাছ থেকে এমনটা আশা করা সত্যিই বেমানান। সন্তানরা বাবা-মাকে অনুসরণ করেই নিজেদের করণীয় নির্ধারণ করে। সুতরাং নিয়মানুবর্তিতার প্রথম অনুশীলন শুরু হতে হবে বাবা-মা থেকে এবং এটি সন্তান জন্ম নেবার আগ থেকেই লক্ষণীয়।**[৩২]

❖ দেয়াল জুড়ে রেললাইন

আমার ছেলের স্কুলে ভলান্টিয়ার টিচার হিসেবে জয়েন করার পর যে জিনিসটি দেখে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ হয়েছিলাম, সেটি হচ্ছে ক্লাসের একপাশে দেয়ালজুড়ে বিশাল একটা রেললাইনের ওপর ছোট ছোট ২৬টা বগি। ২৫টা বগি ক্লাসের ২৫ জন বাচ্চার জন্য; আর একটি তাদের টিচারের। টিচার নিজ থেকে এসেই বলেছিলেন, এই রেললাইন আমাদের 'বেস্ট অব দ্য উইক' বাছাই করার জন্য রাখা হয়েছে। প্রতি সোমবারে এই জার্নি শুরু হয়ে শুক্রবারে শেষ হয়। শুধু পড়াশোনাতে এগিয়ে থাকলেই হবে না, প্রতিটি বিষয়ে যে বাচ্চার পারফরমেন্স সবচেয়ে ভালো হবে, সে পাবে এই খেতাব। অর্থাৎ পড়াশোনা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে যার বগি সবার আগে রেললাইনের শেষ মাথায় গিয়ে পৌঁছবে, সে হবে **'বেস্ট অব দ্য উইক'**। তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে সাপ্তাহিক পুরস্কারের মেডেল।

শিক্ষককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, একটা বগি আপনার জন্য থাকার কারণ কী? হেসে জবাব দিয়েছিলেন, তাদের সাথে আমিও রেসে অংশগ্রহণ করি। আমি যেমন তাদেরকে পয়েন্ট দিই, ওরাও আমাকে দেয়। অর্থাৎ শিক্ষক যেভাবে বাচ্চারা কেউ দুষ্টুমি করলে, বাড়ির কাজ করে না আনলে, মারামারি করলে, নিজের ফাইলপত্র ঠিকমতো গুছিয়ে না রাখলে, ক্লাস নোংরা করলে, স্কুলের পার্কে খেলতে গিয়ে গন্ডগোল করলে, ক্লাসের সময় অকারণে কথা বললে তাদের বগি পিছিয়ে দেন, ঠিক সেভাবে শিক্ষক যদি অকারণে বাচ্চাদের সাথে কখনো হইচই বা বকাঝকা করেন, তাহলে বাচ্চারাও তার বগিকে এক ঘর বা দুই ঘর পিছিয়ে দেয়।

ঠিকমতো বাড়ির কাজ করে নিয়ে যাওয়া, ক্লাসে পড়াশোনা করা, নিজের সবকিছু গুছিয়ে রাখা, বন্ধুদেরকে কোনো ব্যাপারে সহযোগিতা করা, যেকোনো ক্ষেত্রেসুতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে যে যত ভালো, তার বগি রেললাইনে তর এগিয়ে থাকে।

আসলেই, বাচ্চাদেরকে সারাক্ষণ বলে বলে কিছু একটা করতে বাধ্য করা কিংবা কোনো কিছু থেকে ফিরিয়ে রাখা অনেক জটিল ব্যাপার। সেই তুলনায় এই রেললাইন সিস্টেমটা অনেক সহজ আর ফলপ্রসূ। পিছিয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা দুষ্টুমি করে না। এগিয়ে থাকার জন্য না চাইতেও অনেক কিছু চুপচাপ মেনে নেয়। স্বাধীনতা নেই এমন কথাও বলতে পারে না কেউ। কারণ সকলের কোনো নিয়ম পছন্দ হোক আর না-হোক, বেস্ট হতে চাইলে তাকে ছুটতেই হবে। অন্যথায় বন্ধুরা এগিয়ে যাবে, সে পড়ে থাকবে সবার পেছনে।

আইডিয়াটা আমার এত ভালো লেগেছিল, মনে হলো এটা তো বাসায়ও প্রয়োগ করা যায়! সারাক্ষণ 'এটা করো', 'ওটা কোরো না' বলে বাচ্চার সঙ্গে ঘ্যানঘ্যান করা যেকোনো মায়ের জন্যই বিরক্তিকর কাজ। কিন্তু তবু প্রতিটা কথা তাদের বারবার বলতে হয়। সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতে হয়। কারণ সে শিশু। একটা কাজ যদি একবার বললেই ঠিকমতো করে ফেলে বা নিষেধ করলে এড়িয়ে চলে, তাহলে সে আর বাচ্চা থাকল কোথায়?

আমি আমার ছেলের রুমের দেয়ালজুড়ে একটা রেললাইন লাগিয়ে দিলাম, তাতে বসিয়ে দিলাম তিনটা বগি। ছেলে, ছেলের বাবা আর আমার মধ্যে শুরু হলো 'বেস অব দ্য উইক' প্রতিযোগিতা। ভালো হওয়ার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার মজাটা আসলেই অন্যরকম। তখন নিজের থেকে শুধু ভালো ভালো কাজ প্রকাশ পায়। অন্তত ছেলেকে দেখে তা-ই মনে হয়েছে আমার। রুটিনের প্রতিটা কাজ সুন্দর আর সময়মতো করার জন্য আমাকে বারবার তাগাদা দিতে হচ্ছে না। আমি কিচেনে গেলেই ও হাজির হয়ে বলে, আম্মু, তোমার কি কোনো সাহায্য লাগবে? আম্মু চলো, আমিও তোমার সাথে ছাদে যাব, কাপড় রোদে দিতে তোমাকে সাহায্য করব। আত্মীয়স্বজন সবার সাথে ফোনে বা স্কাইপে কথা বলা এবং মাছ-সবজি খাওয়ায় ওর সবচেয়ে বেশি অনীহা ছিল। কিন্তু যেহেতু 'ভালো বাচ্চারা পরিবারে সবার সাথে আন্তরিক আর খাবার নিয়ে ঝামেলা করে না', তাই রেললাইনে এগিয়ে যাওয়ার যাত্রায় এসব ব্যাপারে সে ধীরে ধীরে আগ্রহী হয়ে উঠছে।

শুধু তা-ই নয়, প্রতিযোগিতায় অংশ থাকায় বাবা-মাকে বন্ধু ভাবছে, বাবা-মায়ের বগি এগোবে না পেছোবে, এই হিসাব রাখতে গিয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করাটাও শিখে ফেলছে। আমাদের কোনো আচরণ রূঢ় বা অপছন্দনীয় হলে ও গিয়ে বগি পিছিয়ে দেয়। কারণ জিজ্ঞেস করলে যুক্তি সহকারে বুঝিয়ে বলে, কেন আম্মুরটা পিছিয়ে দিয়েছে আর আব্বুরটা এগিয়ে দিয়েছে এক ঘর সামনে। এভাবে একটা প্রতিযোগিতা বা এগিয়ে থাকবার প্রচেষ্টা চলছে আমাদের মাঝে। শুধু একটা রেললাইন ঘরের পরিবেশকে অনেক বেশি সুন্দর আর আনন্দঘন করে তুলেছে। বাচ্চার সাথে সাথে আমরাও প্রতিটি কাজে সতর্ক আর নিয়মবন্ধ হয়ে উঠছি।

আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, এতে আমার ছেলেটা নিজেই নিজেকে যাচাই করা শিখে যাচ্ছে। ভুল করলে ওর বগি পেছানো আর ভালো করলে আগানোর কাজটি ওকে দিয়েই আমরা করাচ্ছি। এটি ওকে আত্মোন্নয়নের প্রেরণা জোগাচ্ছে।**[৩৩]

❖ গল্পে গল্পে বাচ্চাদেরকে শেখানো

[এক] সপ্তাহে একদিন মেয়েকে সাথে নিয়ে ঘর গোছানোর কাজ করে নাবিলা। মা-মেয়ে দুজন মিলে আসবাবপত্র মোছামুছি থেকে শুরু করে ঘরের সবকিছু যথাস্থানে গুছিয়ে রাখা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া ইত্যাদি সব করে। আজও মা-মেয়ে মহা আনন্দে ঘরের কাজ শুরু করল। হঠাৎ নাবিলার মেয়ে নুশেরার হাত থেকে একটা শোপিস পড়ে ভেঙে গেল। চোখ বড় বড় করে অপরাধী ভঙ্গিতে মায়ের দিকে তাকাল নুশেরা।

নাবিলা বলল, তুমি এত ভারী জিনিসটা কেন ধরতে গেলে মা? যদি তোমার পায়ে পড়ত, কতটা ব্যথা পেতে জানো! সোফায় উঠে বসো, না হয় তোমার পা কেটে যেতে পারে।

সোফায় বসে নুশেরা বলল, আমি কিছুই পারি না, তাই না মামণি? নাবিলা মেয়ের কাছে গিয়ে আদর করে বলল, কে বলেছে তুমি কিছু পারো না?

কেউ বলেনি। কিন্তু আমি জানি, আমি ছোট, তাই কিছুই করতে পারি না।

মামণিও তো কত কিছু করতে পারে না। সবাই সবকিছু পারবে না, এটাই হচ্ছে নিয়ম। খরগোশ আর ব্যাঙের গল্পটা শোনোনি তুমি?

(কৌতূহল মেশানো কণ্ঠে) কোন গল্পটা মামণি? আমার তো মনে পড়ছে না। আরেক বার বলো না মামণি প্লিজ!

(হেসে) আচ্ছা শোনো বলছি। এক বনে ছিল অনেকগুলো খরগোশ। একদিন তারা সবাই মিলে গোলটেবিল বৈঠকে বসল।

গোলটেবিল বৈঠক কী মামণি?

একটি টেবিলকে ঘিরে বসে যখন সবাই নির্দিষ্ট বিষয়ে কথাবার্তা বলে, তখন তাকে গোলটেবিল বৈঠক বলে।

হি হি হি, বনে খরগোশরা টেবিল পাবে কোথায়?

(হেসে) তাই তো! আচ্ছা মামণি, বিরাট ভুল হয়ে গেছে। খরগোশরা সবাই গাছের ছায়ায় বসে 'কে কত দুর্বল', তা নিয়ে আলোচনা করছিল। সবার ভীষণ মন খারাপ ছিল। কারণ তাদের না আছে শক্তি, না আছে সাহস। মানুষ-পশু-পাখি সবাই তাদের শত্রু। সবাই তাদের ধরে ধরে খায়।

(দুঃখী দুঃখী ভঙ্গি করে) ইশ, কত্ত অসহায় খরগোশরা! আমারও মন খারাপ হচ্ছে। তারপর কী হলো মামণি?

বলছি শোনো। খরগোশদের মনে হলো, তাদের এই যন্ত্রণা সহ্য করা থেকে মরে গাওয়া ভালো। যেই চিন্তা, সেই কাজ। একদিন খরগোশরা সবাই মিলে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করার জন্য পুকুরের ধারে হাজির হলো। সেই পুকুরের ধারে বসে ছিল অনেকগুলো ব্যাং। খরগোশদের আসতে দেখে ব্যাংরা সবাই লাফিয়ে পানিতে পড়ল।

ব্যাঙরা ভয় পেয়েছিল খরগোশ দেখে, তাই না?

হ্যাঁ! ভীষণ ভয় পেয়েছিল। ব্যাঙদের ভয় পেতে দেখে সবচেয়ে বয়স্ক খরগোশটি বলল, দাঁড়াও, তোমরা এখনই পানিতে লাফ দিয়ো না। তোমরা কি খেয়াল করোনি, ব্যাঙের দল আমাদের ভয়ে কীভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে? তার মানে, ওরা আমাদের চেয়েও দুর্বল। অর্থাৎ আমরাই এই পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল প্রাণী নই। আমাদের চেয়েও দুর্বল প্রাণী আছে।

মামণি, ছোট খালামণির ছেলে রাফিদ তো আমার চেয়েও দুর্বল, তাই না? হিহিহি, রাফিদ তো নিজ হাতে খেতেও পারে না।

(হেসে) সেটাই তো আমি তোমাকে বলছি মা। নিজেকে কখনো ছোট আর দুর্বল ভাববে না। কারণ তুমি যত ছোট আর দুর্বলই হও না কেন, খুঁজে দেখলে এমন কাউকে অবশ্যই পেয়ে যাবে, যে তোমার চেয়েও ছোট আর দুর্বল।

(সোফা থেকে লাফিয়ে নেমে) আমি আর কখনো এমন ভাবব না। চলো মামণি, ঘর গোছানো শেষ করি।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষা আর উৎসাহের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এগুলো একেকটি এমন জিনিস, যা মানুষের মনে অসাধ্য সাধন করার প্রেরণা জোগায়।

[দুই] বাগানে বসে কাজ করছিলো সিহাব। হঠাৎ কান্নার শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখল, ভাতিজা আয়াত কান্না করতে করতে আসছে। প্রিয় চাচ্চুকে দেখে আয়াতের কান্নার শব্দ আরও বেড়ে গেল। কাজ বন্ধ করে ভাতিজাকে ধরে সিহাব বলল—

কে ছেড়ে দিল চোখের নল,
ঝরছে অঝোর ধারায় জল।
আমারও আঁখি ছলছল,
এখনই বুঝি নামবে ঢল।

চাচ্চুর উপস্থিতি তৈরি ছড়া শুনে আয়াতপর চোখে আনন্দ ঝিলিক দিয়ে উঠলেও কান্না বন্ধ হলো না।

আরে, আরে! কী হয়েছে আমার সোনা বাবাটার? কেন কান্না করছেন আপনি বাবা? ব্যাথা পেয়েছেন, নাকি কেউ মেরেছে?

(ফোঁপাতে ফোঁপাতে), নুসাইবা আমার খেলনা নিয়ে গেছে। সকালে তামান্তা আমার চকলেট নিয়ে গিয়েছিল। সবাই আমার থেকে সবকিছু কেড়ে নিয়ে যায় সবসময়!

সবাই তোমার কাছ থেকে সবকিছু কেয়ে নিয়ে যায়?

(পুতুলের মতো মাথা দুলিয়ে) হ্যাঁ, সবকিছু নিয়ে যায়।

তুমি নিতে দাও কেন? কাউকে কিছু বলো না কেন?

দাদুভাই আমাকে বলেছেন, কাউকে কষ্ট দিতে নেই। আমি যদি কাউকে কষ্ট দিই, আল্লাহ আমায় ওপর রাগ করবেন।

দাদুভাই তোমাকে বলেছেন কাউকে কষ্ট না দিতে, কিন্তু আত্মরক্ষা করতপ তো নিশ্চয় নিষেধ করেননি!

দাদুভাই বসেছেন কারও সাথে রাগ না করতে। কাউকে কষ্ট না দিতে।

আচ্ছা ঠিক আছে। এখন তুমি কান্না বন্ধ করো। চলো, তোমাকে চাচ্চু একটা গল্প শোনাই, শুনবে?

(চোখ মুছে হাসি মুখে) হ্যাঁ, শুনব।

একটি গ্রামে রাস্তার ধারে বাস করত এক সাপ। তার আকৃতি ছিল বিশাল। যে যখন ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করত, ভয়ে সবার রক্ত হিম হয়ে আসত।

সাপটার নাম কী চাচ্চু?

তার নাম মিস্টার ফোঁস ফোঁস। কারণ রাস্তা দিয়ে মানুষ যেতে দেখলেই সে ফোঁস ফোঁস করতে করতে তেড়ে এসে কামড়ে দিত। বিনা দোষে পথচারীরা প্রাণ হারাত। রোজ ফোঁস ফোঁসের এই অত্যাচারের কারণে সেই রাস্তা দিয়ে মানুষের চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। একদিন এক সাধু সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন।

মিস্টার ফোঁস ফোঁস সাধুকেও কামড়ে দিল, তাই না চাচ্চু?

শোনোই না, তারপর কী হলো। মিস্টার ফোঁস ফোঁস অনেক দিন পর মানুষের দেখা পেয়ে ফোঁস ফোঁস করতে করতে ছুটে এলো। কিন্তু সাধুকে কামড়ে দেওয়ার আগেই তুমি মনে মনে কিছু একটা পড়ে তাকে বশ করে ফেললেন। সে তখন মাথা নত করে শুধু চুপ করে রইল। সাধুটি কাছে বসে বললেন, অকারণে মানুষকে কষ্ট দিয়ো না, কারও ক্ষতি করো না, পুরোপুরি হিংসা পরিত্যাগ করো এবং পারলে মানুষের উপকার করো। উপদেশ দিয়ে সাধু চলে গেলেন।

দ্বিখার ফোঁস ফোঁস কি তখন ভালো হয়ে গেল চাচ্চু?

বলছি, কী হলো। এরপর অনেক দিন পার হয়ে যায়। হঠাৎ একদিন সাধুটি ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন, মিস্টার ফোঁস ফোঁস রাস্তার এক কোণে পড়ে আছে। তার শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ। সাধু তখন এগিয়ে গিয়ে বললেন, তোমার এই অবস্থা কী করে হলো?

সে জবাব দিল, আপনার উপদেশ মানতে গিয়ে।

সাধু অবাক হয়ে বললেন, সেটা আবার কীভাবে?

বলল, আপনি বলেছিলেন হিংসা ত্যাগ করো, কাউকে কষ্ট দিয়ো না। যখন থেকে আমি তা করছি, সবাই আমার ওপর অত্যাচার করছে। এখানকার ছেলেরা আমাকে মেরে এক কোণে ফেলে রেখেছে। আমি তাদেরকে কিছুই বলিনি।

তখন সাধু বললেন, আরে বোকা, আমি তোমাকে হিংসা পরিত্যাগ করতে বলেছি, কাউকে অকারণে কষ্ট দিতে বারণ করেছি। কিন্তু আত্মরক্ষা করতে তো নিষেধ করিনি। তুমি অবশ্যই কারও ক্ষতি করবে না। তবে কেউ যেন তোমার ক্ষতি করতে না পারে, তাই ফোঁস ফোঁস করে তাদের ভয় দেখানোতে কোনো দোষ নেই।

এখন বলো, কী বুঝলে গল্প থেকে?

আত্মরক্ষা করব, কিন্তু কাউকে কষ্ট দেব না। আমি কারও ক্ষতি করব না এবং কেউ যেন আমার ক্ষতি করতে না পারে, সেজন্য প্রয়োজনে প্রতিবাদ করব।

মাশাআল্লাহ! এই তো তুমি বুঝে গেছ!**[৩৪]

❖ আল্লাহর সাথে শিশুর সম্পর্ক তৈরি

প্রত্যেক মুসলিম বাবা-মা'ই চান তাদের সন্তানের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা স্থাপন হোক। তারা যেন কখনো আল্লাহর বিধিবিধান থেকে গাফেল না হয়ে যায়।

জীবনে ভালো-মন্দ যেকোনো পরিস্থিতিই আসুক না কেন তারা যেন দ্বীনের পথ থেকে বিচ্যুত না হয়ে যায়। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা, নিজেদের অপারগতা এবং আরও বিভিন্ন কারণে তারা বুঝতে পারেন না, কীভাবে তাদের সন্তানদেরকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত করবেন। সন্তান গর্ভে আসার পর প্রত্যেক বাবা-মাকে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে, তিনি যেন তাদের সন্তানকে দ্বীনের পথে চলার জন্য কবুল করে নেন। তাদের নিজেদেরকেও এ ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হবে। ছোটোবেলা থেকেই পিতামাতা যদি ঘরে দ্বীনি পরিবেশ গড়ে তুলতে পারেন এবং নিজেরা তাদের সন্তানদেরকে নিয়ে দ্বীনের চর্চা করেন, তাহলে সন্তানরা ছোটোবেলা থেকেই আল্লাহকে চিনতে পারবে, আল্লাহর সাথে ও দ্বীনের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে পিতামাতাকে দৃঢ়তা অবলম্বন করতে হবে। সন্তানদেরকে ছোটোবেলা থেকেই সুন্নতি পোশাক পরাতে অভ্যস্ত করতে পারলে খুবই ভালো হবে। আপনারা যখন কুরআন পড়বেন তখন পাশে সন্তানকেও বসিয়ে নিন। বাসায় নিয়মিত এ পরিবেশ গড়ে তুলুন যেন তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। বাচ্চাকে ছোটোবেলা থেকেই মাসনুন দুআগুলো শিখাবেন। ঘুম থেকে ওঠা শুরু করে বাথরুমে যাওয়ার দুআ, বাথরুম থেকে বের হওয়ার দুআ, খাবার শুরুতে এবং শেষে দুআ পড়া, বাসা থেকে বের হওয়ার দুআ এবং বাসায় ঢোকার সময় দুআ পড়া—এসবকিছু বাচ্চাকে হাতে-কলমে শেখাবেন এবং নিজেরাও তার আমল করবেন। আপনি যখন বাইরে থেকে আসবেন তখন বাচ্চাকে সালাম দিন এবং তাদেরকে সালামের উত্তর দিতে শেখান। বাচ্চাদেরকে আগে সালাম দেওয়ার গুরুত্ব বোঝাতে হবে, যাতে করে পরবর্তী সময়ে তারা আপনাকে আগে সালাম দিতে পারে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে আমরা যদি ছোটোবেলা থেকেই সন্তানদের ভেতরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা তৈরি করাতে না পারি তাহলে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ তাদেরকে গাফেল করে দিতে পারে। কেননা, শয়তান তাদেরকে সবসময় দুনিয়ার মোহে ফেলে আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার কুমন্ত্রণা দেবে। এতে করে সন্তান যত বড় হতে থাকে ততই নিজেদেরকে আল্লাহর কাছ থেকে সরিয়ে নিতে থাকে। তখন সালাতের সময় হলে কাজ ফেলে অজু করে সালাত আদায় করার মানসিকতা তৈরি হয় না। যেকোনো কাজ বা বিপদাপদে তারা মানুষের কাছে ছুটে যায়। অথচ আল্লাহকে আগে স্মরণ করা তাদের কাছে শক্তিশালী মনে হয় না। কেননা, ছোটোবেলা থেকে তারা এমন মানসিকতা

নিয়ে বড় হয়নি। তাই ছেলে সন্তানদেরকে আপনার সাথে মসজিদে নিয়ে যান। মা যখন সালাত আদায় করবেন তখন আপনার মেয়েকে পাশে দাঁড় করিয়ে দিন। তাকে নিয়ে সালাত আদায় করুন। সন্তানরা যদি ছোটোবেলায় বাবা-মাকে সালাত পড়তে না দেখে এবং নিজেরাও না পড়ে তাহলে বড়ো হয়ে তারা কীভাবে সালাতের গুরুত্ব বুঝবে? যখনই আপনার সন্তানকে বাইরে নিয়ে যাবেন তখন তাকে দ্বীনি পোশাক পরান এবং দৃষ্টি নত রাখার বুঝ দান করেন। ছোটোবেলা থেকেই অশ্লীলতা এবং উশৃঙ্খলা যেন তাদের ভেতরে জন্ম না নেয় এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এ ক্ষেত্র বাবা-মাকে দৃঢ়তা অবলম্বন করতে হবে এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। আত্মীয়স্বজ ও পরিচিত মহল এ ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। বলতে পারে সন্তানকে ছোটোবেল থেকেই ইবাদত-বন্দেগিতে লিপ্ত করার কী দরকার। বড় হলে এসব করবে; এখন নিজেদের ইচ্ছামতো খেলবে, ঘুরবে, স্বাধীনভাবে চলবে। এটা শয়তানের বড় ধোঁকা। বাবা-মায়েদের এ ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন না করলে শুধু সন্তানরাই নয়, বরং তারাও গাফেল হয়ে যেতে পারে। সন্তানদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করার দায়িত্ব বাবা-মায়ের। সন্তান যখন আপনার কাছে কিছু আবদার করবে তখন সাথে সাথেই দিয়ে দেবেন না বরং তাদেরকে এটা শেখাবেন যেকোনো কিছু আল্লাহর কাছে চাইতে হয়। এতে আল্লাহ খুশি হন এবং ফিরিয়ে দেন না। তাদেরকে সুন্দর সুন্দর প্রার্থন করতে শেখাবেন।

উদাহরণ: আপনার বাচ্চা সাত সকালে উঠে চকলেট খাওয়ার বায়না ধরল। আপনি সাথে সাথেই তার সামনে চকলেট বের করে দিয়ে দেবেন না। বরং তাকে বুঝিয়ে বলুন, যা কিছু চাওয়ার সবার আগে আল্লাহর কাছে চাইতে হয়। 'তুমি তোমার ঘরে গিয়ে আল্লাহর কাছে চকলেট চাও, দেখো আল্লাহ তোমাকে দেয় কিনা'। আপনার বাচ্চার সাথে সাথে চলে যাবে এবং আল্লাহর কাছে চাইতে থাকবে। এরপর তার অগোচরে এমন জায়গায় চকলেট রেখে দিন যেটা সে সহজেই খুঁজে পাবে। যখন সে চকলেট খুঁজে পাবে তখন তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি দঢ় বিশ্বাস জন্মাবে। আস্তে আস্তে যা কিছু চাওয়ার, সে আল্লাহর কাছে চাইবে। যখন আপনার সন্তান এভাবে অন্তর থেকে আল্লাহর কাছে চাইবে তখন আল্লাহ তার ভেতরে ভালোবাসা সৃষ্টি করবেন। তার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। দুনিয়ায় যেকোনো পরিস্থিতিতে আপনার সন্তান সবার আগে তার রব মহান আল্লাহ রাববুল আলামিনকে ডাকবে।

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

“নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরই সঙ্গে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সৎকর্মপরায়ণ।” [সুরা নাহল, আয়াত: ১২৮]

বাচ্চারা ছোটোবেলা থেকেই কোমল হৃদয়ের অধিকারী হয়। তাদের মধ্যে আবেগ থাকে বেশি। কোনো কিছু তাদের মনোমতো না হলে রাগ করে, চিৎকার চেঁচামেচি করে, জিদ করতে থাকে। এমন করলে বাচ্চাকে সময় নিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করুন। পিতামাতার উচিত সবসময় সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা। সন্তানরা যেন তাদের জন্য নয়ন-প্রীতিকর হয় এবং মুত্তাকি ও আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এজন্য আল্লাহর কাছে সবসময় দুআ করতে হবে। মাঝে মাঝে পরিস্থিতি অনুকূল নাও হতে পারে। এসময় বাবা-মায়েদের দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ থাকতে হবে। কখনো হাল ছেড়ে দেওয়া যাবে না অথবা হতাশ হয়ে যাওয়া চলবে না। সন্তানদেরকে ক্রোধ সংবরণ করা শেখাতে হবে। যেহেতু তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা থাকবে সেহেতু আল্লাহ যা অপছন্দ করেন, আল্লাহ যেটাতে অসন্তুষ্ট থাকেন, সেটা আপনার সন্তান করতে চাইবে না। তার সহপাঠী বা খেলার সাথিদের সাথে যখন তারা খেলবে, তখন কেউ তাকে ফেলে দিলে, ব্যথা দিলে আপনার সন্তান যেন প্রতিশোধ নিতে না যায় এবং তাদেরকে ক্ষমা করে-এ শিক্ষা দিন।

উদাহরণ: আপনার সন্তান মাদরাসা/স্কুল থেকে বাসায় ফিরেই অভিযোগ করে বসল আজকে তার অমুক সহপাঠী তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। সে নিজের ক্রোধ সংবরণ করতে পারল না এবং চিৎকার-চেঁচামেচি ও কান্না শুরু করল। এ সময় আপনাকে দৃঢ় থাকতে হবে। পরদিন গিয়ে সেই সহপাঠীর বাবা-মাকে দোষারোপ করবেন না অথবা তাকে বকা দিয়ে দেবেন না। এটি আপনার নেতিবাচক ব্যবহার। আপনার বাচ্চাকে শান্ত করার চেষ্টা করেন এবং তাকে আদর করে এটা বোঝাবেন, 'দেখো বাবা, আল্লাহ তোমাকে কত কিছু দেয়, তুমি প্রার্থনা করে আল্লাহর কাছে কত কিছু নাও কিন্তু তুমি কি চাও আল্লাহ তোমার ওপর কখনো অসন্তুষ্ট হন? জানো, আল্লাহ তাদেরকে খুব পছন্দ করেন, যারা কারও ওপর রাগ করে না, সবাইকে ক্ষমা করে, সবাইকে ভালোবাসে।' এইসব বাচ্চাদেরকে আল্লাহ খুব ভালোবাসেন। কেউ তোমাকে কষ্ট দিলেও তুমি যদি রাগ না করো এবং তাকে ক্ষমা করে দাও তাহলে আল্লাহ তোমাকে আরও ভালোবাসবেন'। এভাবে আপনার বাচ্চা ইতিবাচক চরিত্রের দিকে এগিয়ে যাবে। তাকে এ আয়াত পড়ে শুনাতে পারেন-

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَ الْكَظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“যারা সচ্ছলতা ও অভাবের মধ্যে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষদেরকে ক্ষমা করে; এবং আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।” [সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৪]

দুনিয়াতে আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষা করবেন। এই পরীক্ষা আপনার সন্তান-সন্ততির দ্বারাও আসতে পারে। তাই কখনো যদি মনে করেন তাদেরকে দ্বীনের পথে চালাতে ও মানুষের মতো মানুষ করতে আপনি ব্যর্থ হচ্ছেন, তাহলে কখনই হতাশ হবেন না; বরং আল্লাহর কাছে সবসময় সাহায্য চাইতে থাকুন। সন্তানের জন্য পিতামাতার দোয়া কবুল হওয়ার নিশ্চয়তা হাদিসে রয়েছে। আর এখানে সন্তান নিয়ে আপনি ঝামেলায় পড়েছেন। এই ঝামেলায় আল্লাহ তাআলা অবশ্যই আপনাকে সহযোগিতা করবেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে—

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْأَشْهَادُ

“নিশ্চয় আমি আমার রাসুল ও মুমিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে।” [সুরা আল মুমিন, আয়াত: ৫১]**[৩৫]

❖ তিনি শিশুকে তাওহিদের কালিমা শেখাতে আদেশ করেছেন

জুনদুব ইবনু আবদুল্লাহ বলেন, 'আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংশ্রবে থাকতাম। আমরা ছিলাম তাগড়া যুবক। কোরআন শেখার আগে আমরা ঈমান শিখেছি। অতঃপর আমরা কোরআন শিখেছি ফলে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে।' [সহিহ সুনান ইবনু মাজাহ লিল আলবানি: ৫২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ঈমান শিখিয়েছেন কোরআন শেখানোর আগে। আর ঈমানের ব্যাপারে হাদিস এসেছে:

بضع وسبعون شعبة ،أو بضع وستون شعبة ،فافضلها قول : لا اله الا الله وادناها اماطة الاذي عن الطريق ،والحياء شعبة من الإيمان

"ঈমানের আছে সত্তরের বেশি শাখা। অথবা ষাটের বেশি শাখা। সর্বোত্তম শাখা হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া। আর লজ্জাও ঈমানের অঙ্গ।" [মুসনাদু আহমাদ: ২/১৬৯]

হে বাবা-মায়েরা, আপনারা হয়তো দেখে থাকবেন শিশুটি এখনো কথা বলতে শেখেনি, কিন্তু মুয়ায্যিন যখন আযান দিতে শুরু করে তখন সেও তার অনুকরণের চেষ্টা করে। শুধু তা-ই নয়, উপস্থিত লোকজনের মাঝে সে-ই আযানের প্রতি অধিক মনোযোগ দেয় এবং তাওহিদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যের শব্দাবলি সে উচ্চারণ করতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। সুতরাং হে আমার সন্তানের প্রতিপালনকারী ভাইবোন, আপনি শিশুর এই নিষ্কলুষ ও শুভ্র মানসিকতার যত্ন নিন। তাকে তাওহিদের কালিমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র তালকিন করতে থাকুন।

ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, 'নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর মৃত্যুর সময় নিজ ছেলেকে বললেন, আমি তোমাকে লা ইলা ইল্লাল্লাহকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিচ্ছি। সমস্ত আকাশ ও মাটি যদি এক পাতায় রাখা হয় আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে আরেক পাল্লায় রাখা হয় তাহলে কালিমার পাল্লা ভারী হয়ে যাবে।' [মুসনাদু আহমাদ: ২/১৬৯]

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ’তোমরা তোমাদের বাচ্চাদের প্রথম কথা ফোটাও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং মৃত্যুর সময়ও তাদের লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর তালকিন করো।’ [তোহফাতুল আহওয়াধি: ৪/৪৬]

এই হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, শিশু যখন কথা বলতে শিখবে, তার মুখে বোল ফুটবে, তখনই তাকে ঈমানের সেই শব্দের তালকিন করতে হবে যা ঈমানের অন্যান্য সকল শাখার মূল। সেটি হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

কোনো এক কমিকস বইয়ে পড়েছি, এক স্ত্রীলোক তার শিশু-সন্তানের দিকে তাকিয়ে আছে আর তার গায়ক স্বামী তাকে বলছে, ছেলেটি প্রথমে বাবা না বলে বলুক 'হে রজনী'! (গায়কের পছন্দের কোনো গানের শব্দ)

হ্যাঁ, একজন গায়ক এবং মিউজিশিয়ানের মুখে এটা আশ্চর্যের কিছু নয়। কিন্তু সাধারণ মুসলিমদের অবস্থাও আজ এরূপ হয়ে গেছে। উদাহরণ অনেক আছে। কয়টি বলব! শুধু একটি বলছি। এক ব্যক্তিকে দেখেছি। সাথে তার চার বছরের বাচ্চা আছে। একজন এসে বাচ্চাটিকে তার নাম জিজ্ঞেস করল। বাচ্চাটি কোনো এক সিংগারের নাম বলল। লোকটি তাকে আহ্লাদ করে বলল, তুমিও কি তার মতো গান করতে পারো? বাচ্চার বাবা বলল, হ্যাঁ, সে পারে। ছেলেটিকে বলল, গানটি গাও তো। ছেলেটি তখনি গাইতে শুরু করল। অথচ ছেলেটির বোল এখনো ভালো করে ফোটেইনি। সে 'কাফ'কে 'তা' উচ্চারণ করছিল!

আহ! কথা আর বাড়িয়ে লাভ কী? যার হৃদয় আছে, শোনার শক্তি আছে, দেখার দৃষ্টি আছে সে হয়তো আমার মতোই বলে উঠবে, কোথায় যাচ্ছে আজকের এই মুসলিম সন্তানগুলো! আমাদের পূর্বসূরীদের সন্তানদের অবস্থা তো ছিল যুদ্ধের মাঠে ঘোড়ার পিঠে চড়ে উল্কা বেঁকে ছুটে চলার।

فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام
"আল্লাহ তায়ালা যার হেদায়েত চান ইসলামের জন্য তার বুক অবারিত করে দেন।" [সূরা আনআম, ৬ : ১২৫]**[৩৬]

❖ সন্তানকে কোরআন শিক্ষাদান

ইমাম সুয়ুতি রহিমাহুল্লাহ বলেন, সন্তানকে কোরআন শেখানো ইসলামের মৌলিক একটি নীতি। শিশুরা ফিতরাতের ওপর বেড়ে ওঠে। খায়েশের পরিবর্তে তাদের অন্তর বেশি ধাবিত হয় হিকমাহ ও কল্যাণের আলোর দিকে।

ইবনু খালদুন তার মুকাদ্দিমায় সন্তানদের কোরআন শেখানোর ব্যাপারটির তাগিদ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, সন্তানদের কোরআন শিক্ষা দেওয়া মুসলিম উম্মাহর একটি শি'আর। সকল মুসলিম শহরে এই রেওয়াজ চালু আছে। সকলেই তা গ্রহণ করেছে। কোরআনের আয়াতসমূহের তিলাওয়াত অন্তরে ঈমানের প্রভাব বৃদ্ধি করে। ঈমানের শেকড়কে দৃঢ় করে। কোরআনের শিক্ষাই হলো মূল শিক্ষা।

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আপন সন্তানদের কোরআন শিক্ষার ব্যাপারে যত্ন নিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাদের উৎসাহ দিয়েছেন। আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন কোরআন খতম করতেন পরিবারের লোকজনকে জড়ো করে তাদের নিয়ে দুআ করতেন।

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে দেখুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায়ই তিনি কোরআনের বিধিবিধান সংবলিত আয়াতগুলো মুখস্থ করে নিয়েছেন। অথচ তখন তিনি খুবই ছোট ছিলেন।

আমাদের মহান পূর্বসূরিদের সকলে তাঁদের সন্তানকে শৈশবেই কোরআন শেখাতেন এবং তা হিফয করাতেন। তাদের ধারণক্ষমতা অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় তাদের মুখস্থ করিয়ে দিতেন। বড় হয়ে তারা সেগুলোর গভীরে পৌঁছুতে পরত। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাঁর সাথিদের বলতেন, 'তোমরা আমাকে সুরাহ নিসা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারো। আমি তা শৈশবেই পড়ে নিয়েছি।' (মুসতাদরাকে হাকেম)

খলিফা মামুনকে দেখুন, তিনি ছোট বয়সেই কোরআনকে কত ভালোভাবে বুঝতে শিখেছিলেন! তার উস্তায কাসাঈ রহিমাহুল্লাহকে তিনি কোরআন শোনাতেন। কাসাঈ রহিমাহুল্লাহর অভ্যাস ছিল, মামুনুর রশিদ তিলাওয়াত করতে থাকলে তিনি মাথা নিচু করে রাখতেন। ভুল পড়লে

মাথা তুলতেন। এটা দেখে মামুনুর রশিদ বুঝতেন যে পড়ায় ভুল হয়েছে, ফলে শুধরে নিতেন। একদিন তিনি সূরাহ সফ পড়ছিলেন। যখন তিনি এ জায়গায় পৌঁছলেন:

يا أَيُّها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون
"হে ঈমানদারগণ, তোমরা তা কেন বলো যা তোমরা করো না?" [সূরাহ সফ, ৬১ : ২]

ইমাম কাসাঈ মাথা তুললেন। এটা দেখে মামুনুর রশিদ আয়াতটি বারবার পড়তে লাগলেন। দেখলেন যে, তিনি ঠিকই পড়েছেন, ভুল হয়নি। তিনি পড়া চালিয়ে যেতে লাগলেন। কাসাঈ রহিমাহুল্লাহ যখন চলে গেলেন, মামুনুর রশিদ তার বাবার কাছে গিয়ে বললেন, আপনি কি উস্তাযকে কিছু দেওয়ার ওয়াদা করেছিলেন? হারুনুর রশিদ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কীভাবে জানলে।' মামুনুর রশিদ ঘটনাটি খুলে বললেন। ছেলের বুঝ এবং উপলব্ধির গভীরতা দেখে তিনি চমৎকৃত হলেন।

কোরআন শেখানোর সাথে সাথে সন্তানকে অবশ্যই ঈমানের মৌলিক বিষয়াবলি শিক্ষা দিতে হবে। যেমন: আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসুল।জান্নাত-জাহান্নামের পরিচিতি, হালাল-হারামের প্রভেদ সন্তানের বুঝ ক্ষমতা অনুপাতে তাকে শেখাতে হবে। হায়া-লজ্জাসহ ঈমানের অন্যান্য শাখা সম্পর্কেও জানাতে হবে।

জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা যখন ছোট ছিলাম, কোরআন শেখার আগে আমরা ঈমান শিখেছি।**[৩৭]

❖ তিনি ছোটদেরকে রাসূলের ভালোবাসা, নবি-পরিবারের ভালোবাসা, সাহাবায়ে কেরামের ভালোবাসা এবং কোরআন তিলাওয়াত শিখিয়েছেন

মানুষ এখন যে দিশাহীন অবস্থার মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে এর প্রধানতম কারণ হলো সেল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণ পরিত্যাগ করা। সুতরাং, মানবজাতিকে এই অবস্থা থেকে বের করে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হলে মৌলিক যে কাজটি করতে হবে সেটা হলো, শিশুদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা শেখাতে হবে। রাসূলের মান্যতা, শ্রদ্ধা তাদের হৃদয়ে গেঁথে দিতে হবে। রাসূলের ব্যক্তিত্বের সাথে তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্র এবং মুহূর্তগুলোকে জুড়ে দিতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাঁদের সন্তানদের রাসূলের ভালোবাসা শিখিয়েছেন। রাসূলের খেদমতে তাদের সোপর্দ করেছেন। যেমন: আনাস, ইবনু আব্বাস এবং অন্যান্যরা রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের হৃদয় ও মনকে তাঁর নিজ ভালোবাসার বন্ধনে বেঁধে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন:

لا يؤمن أحدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার সন্তানসন্ততি, মা-বাবা এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় না হব।" [বুখারী : ১৫, মুসলিম, ঈমান অধ্যায় : ৬৩]

এমনিভাবে তিনি তাদের হৃদয়কে জুড়ে দিয়েছেন আহলে বাইতের ভালোবাসার বন্ধনে। হাসান এবং হুসাইন বিন আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সম্পর্কে তিনি বলেছেন:

اللهم إني أحبهما فأحبهما ومن أحبهما فقد أحبني

"হে আল্লাহ, আমি এদের ভালোবাসি, আপনিও এদের ভালোবাসুন। আর যে এদের ভালোবাসে সে আমাকেই ভালোবাসে।" [বুখারী : ৩৫৩৭; তিরমিজি : ৩৭৮২]

তাদের দুজনের বাবা সম্পর্কে তিনি বলেছেন:

وأبوهما خير منهما

"তাদের বাবা তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ।"

আল্লাহ তাআলা তাঁদের সবার ওপর সন্তুষ্ট হোন।

সন্তানদের কোরআন শেখাতেও আছে তাঁর নির্দেশনা। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাঁধ বা ঘাড়ে তাঁর হাত রাখলেন। অতঃপর বললেন:

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل

“হে আল্লাহ, আপনি একে দ্বীনের বুঝ দান করুন এবং কোরআনের ব্যাখ্যা শিখিয়ে দিন।" [মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ৯/২৭৬]

ইবনু কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদিসের ভাষ্যসমূহের আলোকে যেটা বুঝে আসে সেটা হলো, সন্তানকে তার শৈশবেই কোরআন শিক্ষা দেওয়া বৈধ। কখনো সেটা মুস্তাহাব, কখনো-বা ওয়াজিব। কেননা, শিশুরা যখন কোরআন শিখে নেয় আর এমতাবস্থায় যদি সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তাহলে সালাত আদায়ের জন্য তাকে বেগ পেতে হবে না। আর শৈশবে কোরআন মুখস্থ করাটা বয়স হওয়ার পর মুখস্থ করার চেয়ে ভালো। শৈশবে মুখস্থ করার ফলে কোরআন তার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে যায়। এ যুগে মানুষেরা এমনটিই করছে।

আমাদের মহান সালাফের কেউ কেউ বলেছেন, শিশুদেরকে তাদের শৈশবে খেলার জন্য ছেড়ে দেওয়া উচিত। এরপর যখন কিছুটা বুঝ তৈরি হবে, কোরআনের মর্যাদা ও ইহতিরাম সে অনুধাবন করতে শিখবে, তখন তাদের হাতে কোরআন তুলে দিতে হবে। যাতে কোরআনকে সে সম্মান করে এবং কোরআনকে সামনে নিয়ে খেল-তামাশায় লিপ্ত না হয়।

কোনো কোনো সালাফ শিশুদের বুঝ হওয়ার আগে কোরআন শিক্ষা দেওয়াকে অপছন্দ করেছেন। বুঝতে শেখার পর কোরআনের পাঠ দিতে বলেছেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'শিশুদের পাঁচটি আয়াত শেখাও (অর্থাৎ এই পরিমাণ, যার দ্বারা সে সালাত আদায় করতে পারে)। [ইবনু কাসির, মুকাদ্দিমা, তালিমুস সিবয়ান আল কুরআন পরিচ্ছেদ : ১০১]**[৩৮]

❖ দুঃখ ও মুসিবতের সময় তাদের আল্লাহ তাআলার সাথে জুড়ে দিয়েছেন

সুদ্দি রহিমাহুল্লাহ বলেন, রাসূলের এক সাহাবি আউফ বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। মুশরিকরা তাকে বন্দী করে রেখেছিল। তার বাবা রাসূলের কাছে এসে তার ছেলের অবস্থা এবং নিজের পরিবারে তার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে বলে অনুযোগ করতে লাগল। রাসূল তাকে ধৈর্য ধরতে উপদেশ দিলেন এবং বললেন, 'শীঘ্রই আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য কোনো উপায় করে দেবেন।' কয়েক দিন না যেতেই তার ছেলে আউফ দুশমনের হাত থেকে পালাতে সক্ষম হলেন এবং তাদের উট নিয়ে বাবার কাছে চলে এলেন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো:

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

"এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দেবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট।" [সূরা তালাক, ৬৫ : ২,৩]

ইবনু আবি হাতিমের রিওয়ায়েতে আছে, মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, মালিক আল আশজায়ি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, আমার ছেলে আউফ বন্দী হয়ে গেছে। রাসূল তাকে বললেন, 'তোমার ছেলের কাছে এ কথার সংবাদ পাঠাও, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে বেশি বেশি লা হাওলা ওয়া কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পড়তে বলেছেন।'

কাফিররা তাকে চামড়ার দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। হঠাৎ সেটা খুলে পড়ে গেল। তিনি বেরিয়ে এলেন। একটি উটনী দেখে তাতে চড়ে বসলেন। কিছুটা এগিয়ে দেখতে পেলেন শত্রুদের চারণভূমিতে তাদের পশুগুলো চড়ে বেড়াচ্ছে। তিনি একটি আওয়াজ দিলেন। গোটা পশুপাল তার পিছে পিছে চলতে লাগল।

বাড়িতে বসে তার মা-বাবা দুশ্চিন্তা করছিলেন। তারা হঠাৎ দরজায় তাদের ছেলে আউফের কণ্ঠ শুনতে পেলেন। তার বাবা বলে উঠলেন, কা'বার রবের শপথ, এটা তো আউফের গলা! তারা উভয়ে এবং তাদের খাদেম দৌড়ে গিয়ে দরজা খুললেন। দেখতে পেলেন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে আছেন। গোটা উঠান উট দিয়ে ভরে গেছে। তিনি তার বাবাকে সব খুলে বললেন। তার বাবা বললেন, তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি রাসূলের কাছে জিজ্ঞেস

করে আসি। রাসূলের কাছে পৌঁছে তিনি আউফ এবং উটের পালের বিবরণটি শোনালেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন:

اصنع بها ما احببت، وما كنت صانعا بمالك

"এগুলো নিয়ে যা ইচ্ছে করতে পারো। তুমি তোমার সম্পদেই হস্তক্ষেপ করছ।"

অতঃপর এ আয়াতটি নাযিল হলো:

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

"এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দেবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট।" [সূরা আত তালাক, ৬৫: ২, ৩]**[৩৯]

❖ তিনি তাদের আরবি ভাষা শেখাতে যত্ন নিয়েছেন

সাহাবায়ে কেরামের সন্তানদের লেখাপড়া শেখাতে তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। কোরআন ও সুন্নাহর ভাষা হলো আরবি। এই ভাষা যত ভালোভাবে শেখা হবে শরিয়তের ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে সেটা ততই কাজে আসবে। এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়ালেখার ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। বদরের যুদ্ধে বিরোধীপক্ষের কিছু বন্দীর মুক্তিপণ নির্ধারণ এভাবে করেছিলেন যে, মুক্তিপণ বাবদ অর্থ পরিশোধে অক্ষম প্রত্যেকে সাহাবায়ে কেরামের দশ দশটি বাচ্চাকে লেখাপড়া শেখাবে।

ইবনু সা'দ বলেন, বদরের যুদ্ধে সত্তর জন কাফির মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়। বন্দীদের ধন-সম্পদ অনুপাতে মুক্তিপণ নির্ধারণ করা হয়। মক্কাবাসীরা লিখতে জানত। মদিনাবাসীরা লিখতে জানত না। যেসব বন্দীর কাছে মুক্তিপণের অর্থ ছিল না তাদের কাছে মদিনাবাসীদের দশ দশজন সন্তান শিক্ষাদানের জন্য অর্পণ করা হয়। যখন তারা ভালোভাবে লিখতে শিখে যেত সেই বন্দীকে মুক্তি দিয়ে দেওয়া হতো। [তাবাকাতে ইবনু সাদ : ২/২২]

ইবনু সা'দ আরও বলেন, সেদিন বদরের বন্দীদের মুক্তিপণ নির্ধারণ হয়েছিল চার হাজার দিরহাম। যাদের এই মুক্তিপণের সামর্থ্য ছিল না তারা যদি লিখতে জানত, লেখা শেখানো ছিল তাদের মুক্তিপণ। [প্রাগুক্ত : ২/২৬]**[৪০]

❖ সুন্নাহ শিক্ষাদান

আমাদের মহান পূর্বসূরিরা কোরআনের সাথে সন্তানদেরকে রাসূলের সুন্নাহও শেখাতেন। কোরআন এবং সুন্নাহ হলো ইসলামের মূল ভিত্তি। বুখারি রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি হাদিস মুখস্থ করার নির্দেশনা পেয়েছি যখন আমি মকতবে যেতাম। বলা হলো, তখন বয়স কত ছিল আপনার? তিনি বললেন, দশ বছর বা এরচেয়ে কম। [ফায়যুল বাড়ি লিল কাশ্মিরি : ১/৩৩]

ইমাম শাফেয়ি রহিমাহুল্লাহ বলেন, সাত বছর বয়সে আমি কোরআন হিফয করেছি। দশ বছর বয়সে আমি 'মুয়াত্তা' মুখস্থ করেছি। [তাবাকাতুল হুফফাজ লিস সুয়ুতি : ১৫৪]

ইবনু খালদুন রহিমাহুল্লাহ সাত বছর বয়সে কোরআন মুখস্থ করেছেন। আর বিশ বছরে পা দেওয়ার আগেই ভাষা, সাহিত্য, ফিকহ, উসুল, তাফসির, হাদিসসহ আরও অনেক শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন।**[৪১]

❖ শিশুদের বিনোদন ও খেলাধুলা

চার বছর আগে শিশুদের নিয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। বিষয়—শিশুদের মানসিক বিকাশ। বক্তব্যের একপর্যায়ে একজন শিশুবিশেষজ্ঞ ভাই বলছিলেন, বাবা-মায়েরা সন্তানদের সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য কিংবা বিনোদন দেওয়ার জন্য নানানভাবে চেষ্টা করে থাকেন। অথচ আমরা ভুলে যাই, শিশুদের খেলাধুলাই হতে পারে তাদের সৃজনশীলতার বিকাশ ও বিনোদনে একটা কার্যকরী মাধ্যম। সেক্ষেত্রে খেলা হতে হবে এমন, যেগুলো থেকে শিশুর সৃষ্টিশীলতা অর্জন করতে পারে এবং সাথে সাথে তাদের বিনোদনের চাহিদাও পুরণ হয়। এজন্য বাবা-মাকে খেলার নিত্য-নতুন কৌশল খুঁজে বের করতে হবে এব শিশুদেরকেও নতুন নতুন খেলা খুঁজে বের করতে উৎসাহিত করতে হবে। সৃজনশীল কাজ থেকে আনন্দ খুঁজে পাওয়া যায়, আনন্দ পায় বলেই শিশুরা যেকোনো খেলার মধ্যে নতুনত্ব পছন্দ করে। এভাবে করে তাদের বিনোদনের চাহিদাও পূরণ হয়।

আমরা আমাদের বাচ্চাদের জন্য নতুন নতুন খেলা খুঁজে বের করার চেষ্ট করেছিলাম, বিভিন্নভাবে ভেবেছিলাম বিষয়টি নিয়ে। কিন্তু চিন্তা করতে গিয়ে যে খেলাই মাথায় আসছিল, দেখলাম সবগুলোর চর্চাই আমাদের আশেপাশে আছে। তখন আমরা একটা কৌশল করলাম—পুরোনো খেলাগুলোকেই নতুন পদ্ধতিতে ঢেলে সাজালাম। যেমন, লুডু খেলার অনুকরণে আমরা নিজেরা একটা ঘর বানালাম। খেলার পদ্ধতি একই থাকল, শুধু উপকরণ বদলে দিলাম। যেমন, খেলা শুরুর পর কারও হয়তো তিন পড়ল, তখন সে দেখবে তিনের ঘরে কী লেখা আছে। যেটা আছে, তাকে সেই কাজটি করতে হবে। প্রতিটি ঘরেই এমন কিছু না কিছু লেখা ছিল, যা খেলার রুলস অনুযায়ী সবাই পালন করত। কোনো ঘরে লেখা ছিল 'একটা কবিতা বলো', কোনো ঘরে 'পাঁচটি ফল-ফুল বা প্রাণীর নাম বলো', কোনো ঘরে 'যেকোনো একটি ফল খাও', কোনো ঘরে '১০ ঘর সামনে যাও'। কোনো ঘরে আবার 'প্রথম থেকে খেলা শুরু করো' ইত্যাদি ইত্যাদি।

একই কাজ বেশিদিন করতে যেহেতু শিশুদের ভালো লাগে না, তাই কয়েকদিন পরপর ঘরের লেখাগুলো বদলে নতুন কিছু যোগ করা হতো।

এটি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের খেলা আছে, যাতে শিশুরা আনন্দ পায়, আবার তাদের লেখাপড়াও হয়ে যায়। যেমন, বড়রা মনে মনে একটা জিনিস চিন্তা করবে আর শিশুদের কাজ হচ্ছে,

১০টা প্রশ্ন করে সেটা বোঝার চেস্টা করবে। আবার কখনো শিশুরা মনে মনে চিন্তা করবে, বড়রা প্রশ্ন করে সেটা খুঁজে বের করবে। কখনো একটা জিনিস সম্পর্কে পাঁচটা প্রশ্ন দেওয়া থাকবে, প্রশ্ন পড়ে বা শুনে শিশুদেরকে বুঝতে হবে জিনিসটা কী। এই খেলার সাহায্যে খুব সহজেই তাদের চিন্তাশীলতার বিকাশ ঘটে।

আরেকটা খেলা হলো, একটা ট্রেতে ২৫-৩০ রকমের জিনিস রেখে শিশুদেরকে তিন মিনিট খুব ভালোমতো দেখতে দেওয়া হবে। তারপর সেটা ঢেকে দিয়ে তাদের বলা হবে-কী কী দেখেছ, লেখো বা মুখে বলো।

কখনো দেশ, ফুল, ফল, পাখি ইত্যাদির নাম কাগজে লিখে সব একত্রে মিশিয়ে ফেলে প্রত্যেকটা সাবজেক্টকে খুঁজে খুঁজে আলাদা করতে বলা হয়। 'আমি একটা জিনিস দেখছি, তুমি কি তা দেখছ?'-এভাবেও প্রশ্ন করার মাধ্যমে কোনো জিনিস খুঁজে বের করাটা হতে পারে শিশুদের জন্য মজার একটা খেলা।

কখনো কখনো শিশুদের নতুন কোনো খেলা খুঁজে বের করতে উৎসাহিত করতে হবে। কয়েকদিন আগে স্কুলের বাচ্চাদের আমরা বলছিলাম, আজ তোমরা নতুন কোনো খেলা খুঁজে বের করো। একজন বলল, আমি তোমার কানে কানে একটা শব্দ বলব, তুমি পাশের জনের কানে বলবে, সে বলবে তার পাশের জনের কানে, এভাবে গ্রুপের প্রত্যেকের কানে কানে শব্দটা ঘুরে বেড়াবে। সবাই বলতে পারলে নতুন আরেকটা শব্দ নিয়ে আবারও খেলা চলবে। কেউ যদি সঠিক শব্দটা বলতে না পারে, সে খেলা থেকে আউট। যেহেতু কানে কানে ফিসফিস করে বলা হয়, তাই প্রায়ই ভুল হয়। খুব মজা পাচ্ছিল বাচ্চারা খেলাটা খেলতে। আরেকজন বলল, আমি একটা শব্দ বলব, সেটার শেষ অক্ষর দিয়ে অন্য একটা শব্দ বলতে হবে, যে বলতে পারবে না সে আউট। খুবই সহজ আর কমন একটা খেলা, কিন্তু এটা খেলে বাচ্চারা ভীষণ আনন্দ পেল। আরেকটি খেলা হলো, বাচ্চাদের সামনে একটা কবিতা ধীরে ধীরে পড়া আর তাদেরকে খেয়াল করতে বলা, পুরো কবিতায় কোন শব্দটি সবচেয়ে বেশি বার এসেছে? এই খেলা বাচ্চাদেরকে মনোযোগী হতে বেশ সহায়তা করে।মোটকথা, শিশুদেরকে বিনোদন দেওয়ার জন্য খেলা যেমন খুবই কার্যকারী মাধ্যম, আবার একই জিনিস একটু ভিন্নভাবে সাজালে সেটি হয়ে যায় শিক্ষার পদ্ধতি। তবে খেয়াল রাখতে হবে, একই খেলা বা পদ্ধতি যেন বেশিদিন না চলে। এতে তাদের মনে বিরক্তি কাজ করতে পারে এবং খেলতে খেলতে পড়ার ব্যাহত হবে। আর শিশুদের সাথে এসব খেলা খেলতে খুব বেশি সময়েরও দরকার

হয় না। তাই শুধু ইচ্ছা আর সামান্য চেষ্টা থাকলেই খেলাকে করে তোল যায় তাদের সৃজনশীলতা বিকাশ ও আনন্দদানের মাধ্যম।**[৪২]

❖ শিশুকে সক্ষম হতে এবং দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করুন

وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رَبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَآخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ.
لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ. اللهُ يَعْلَمُهُمْ. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ

“তোমরা কাফিরদের মোকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সদাসজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, যার দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করবে। এ ছাড়া অন্যান্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জানো না, কিন্তু আল্লাহ জানেন। আর তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করো, তার প্রতিদান তোমাদেরকে পুরোপুরি প্রদান করা হবে, তোমাদের প্রতি (কম দিয়ে) অবিচার করা হবে না।” [সুরা আনফাল, আয়াত : ৬০]

আপনার বাচ্চাকে এমনভাবে বড় করে তুলুন যাতে করে তার ভেতরে নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস জন্ম নেয়। সে যেন বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং কঠোর পরিশ্রম করতে এগিয়ে যায়। আজকালকার যুগে নতুন তথ্য-প্রযুক্তিতে জীবনযাত্রা অনেকটাই ছোটো হয়ে এসেছে। পিতামাতা তাদের বাচ্চাদেরকে এগুলোর সঙ্গে যুক্ত করে মনে করছেন তাদেরকে চটপটে বানাচ্ছেন; কিন্তু আদতে তারা অলস হচ্ছে এবং তাদের বুদ্ধি, মন-মানসিকতা ও সক্ষমতা বিকশিত হচ্ছে না। বাচ্চাদেরকে হাতে-কলমে নিজের কাজ নিজে করতে শেখাবেন। তাদের হাতে ডিভাইস দিয়ে দেবেন না, এতে করে তারা এসবের নেতিবাচক দিকগুলোতে জড়িয়ে পড়বে। তাদের কথার জড়তা দূর করুন। তিন বছর বয়স থেকেই তাদেরকে কুরাআন শিক্ষা দিন। পিতামাতা যদি সহিহ-শুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে পারেন তাহলে ছেলে-মেয়েদেরকে অবশ্যাই কুরআন পড়তে শেখানো অথবা বাড়িতে উস্তাদ রেখে দিন। তাদের হাত-পা আঙুলের ব্যবহারের দক্ষতা অর্জনের জন্য ছোটোবেলা থেকেই আরবি হাতের লেখা শেখাবেন। বাচ্চারা সারাক্ষণ যদি ডিভাইস নিয়ে বসে থাকে তাহলে এগুলোর প্রতি দক্ষতা অর্জন হবে না। তাদের ছোট্ট মনে এক আলাদা অবিশ্বাসী, উদ্ভট জগৎ তৈরি হবে, যা তাদের উন্নত মনোবিকাশে ভীষণভাবে ব্যাঘাত ঘটায়। বাচ্চার দুই বছর হয়ে গেলেই তাকে পাশে নিয়ে দাঁত ব্রাশ করা, নিজের জামা-কাপড় নিজে পরতে শেখানো, নিজের খেলনাগুলো গুছিয়ে রাখা ইত্যাদি ছোটো ছোটো কাজগুলোতে অভ্যস্ত করতে শেখান। বাচ্চাদের কাজে আনন্দ নিয়ে আসুন। তাদেরকে কখনোই চরম শাসনের গৎবাঁধা রুটিনে ফেলে দেবেন না। তাদের প্রতি দয়ালু হোন এবং নম্রতার সাথে নসিহ্য করুন। ছোটোবেলা থেকেই যেন বাচ্চারা বড়দেরকে সম্মান করা এবং ছোটোদের স্নেহ করার প্রতি বিশেষ জোর দেয়। আপনাদের থেকেই যেন সেগুলো শুরু হয়। অর্থাৎ কখনো যদি তারা আপনাদের সাথে বেয়াদবি করে ফেলে তাহলে তাকে সাথে সাথেই নম্রতার সাথে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন।

পিতামাতার গুরুত্ব এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তারা যেন ছোটোবেলা থেকেই উৎসাহিত হয়। তাদেরকে এই বয়স থেকেই ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে ওঠার সুযোগ দিন। তাদেরকে সালাম দিন এবং তারাও যেন সালাম দেওয়া এবং সালামের উত্তর দিতে শিখে। বাড়িতে কেউ নেই অথবা কোথাও গেলে এবং কারও সঙ্গে দেখা হলে আপনার সন্তান যেন সবার আগে সালাম দিতে শিখে এবং কেউ সালাম দিলে সুন্দরভাবে সালামের উত্তর দিতে পারে। আজান হলে যে যেখানেই থাকুন না কেন চুপ করে যাবেন এবং আপনার বাচ্চাকে আজানের উত্তর দিতে শেখাবেন। মাসনুন দুআগুলো তাদেরকে আয়ত্ত করান। ছোটো ছোটো দুরুদ শরিফ শেখাবেন। দ্বীনি আত্মীয়স্বজন এবং তাদের বাচ্চাদের সাথে বাচ্চাকে মিশতে দিন। ঘরে দ্বীনি পরিবেশ বজায় রাখুন। বাচ্চাকে যদি ছোটোবেলা থেকেই এভাবে বড় করে তোলেন তাহলে তার অন্তরে ইসলামের মর্যাদা এবং গুরুত্ব গেঁথে যাবে এবং সেও তার জীবনকে এভাবেই পরিচালিত করবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময়ের সঠিক ব্যবহারের আদেশ করেছেন। অবসর সময় তিনি তির-তলোয়ার চালনা ইত্যাদি কাজে মগ্ন হওয়া উচিত। সালামা বিন আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল একবার আসলাম গোত্রের কিছু
লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা নিক্ষেপণের প্রতিযোগিতা করছিল। তিনি তাদের লক্ষ্য করে বললেন:

ارمو يا بني اسماعيل ،فان اباكم كان راميا
"নিক্ষেপ করতে থাকো হে ইসমাইলের সন্তানরা। নিশ্চয় তোমাদের বাবা তিরন্দায ছিলেন।"
[বুখারী, জিহাদ ও সিয়ার অধ্যায় : ২৬৮৪]

এমনিভাবে বাচ্চাদের বিভিন্ন শারীরিক দক্ষতা, বিশেষ করে যেগুলো হাদিসে এসেছে সেসব ব্যাপারে দক্ষ করে তুলুন। দৌড়, অশ্বারোহণ, সাইকেল চালানো, তির চালানো,মর্শাল আর্ট, সাঁতার শেখানো, ইত্যাদি শারীরিক কসরতের চর্চা করার মাধ্যমে সাহসিকতা, বীরত্ব, কর্মক্ষমতা অনেক গুণে বৃদ্ধি পায়। ভীতি, কাপুরুষতা, অলসতা দূর হয়ে যায়। একজন মুসলিম তরুণের কর্তব্য হলো সর্বদা প্রস্তুত থাকা। যেন হঠাৎ আপতিত সংকটে দুশমনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেতে পারে।

আব্দুর রহমান বিন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو ،إلا أربع خصال : مشي الرجل بين الغرضين و تاديبه فرسه وملاعبته أهله وتعليم السباحة
"আল্লাহ তাআলার স্মরণ ছাড়া যা আছে তা সবই অর্থহীন। তবে চারটি জিনিস এর ব্যতিক্রম:

ক. দুটি লক্ষ্যের মাঝে হাঁটাহাঁটি করা।

খ. ঘোড়াকে প্রশিক্ষিত করা।

গ. জীবনসঙ্গিনীর সাথে বিনোদন।

ঘ. এবং, সাঁতার শিক্ষা করা।" [আত তারগিব ওয়াত তারহিব লিল মুনযিরি : ২০১৪]

দুটি লক্ষ্যের মাঝে হাঁটাহাঁটি করার মানে হলো লক্ষ্যবস্তু ঠিক করে তাতে তির নিক্ষেপ করা বা দৌড় প্রতিযোগিতা করা।

আবু উমামাহ বিন সাহল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পত্র লিখেন যে, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাঁতার এবং নিক্ষেপণ শিক্ষা দাও।' [মুসনাদু আহমাদ : ৩২৩]

এখানে একটি বিষয় খেয়াল রাখা দরকার। এসব কাজের মাধ্যমে অবসর সময়গুলো কাটানোর মানে বিনোদিত হওয়া নয়; বরং একঘেয়েমি দূর করে উদ্যম লাভ করা। আর অর্জিত এই উদ্যম ব্যয় করতে হবে নেক কাজ এবং ইবাদাত-বন্দেগিতে মগ্ন হয়ে।

দৌড়, ব্যায়াম ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে ইবাদাত করার উদ্যম লাভ হয় বিধায় এসব কাজেও সাওয়াব নিহিত রাখা হয়েছে। কিন্তু আফসোসের কথা হলো, মানুষ আজকাল ওপরে বর্ণিত বিনোদনমূলক কাজগুলোকেই জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছে। এসব সাধারণ বিনোদনমূলক কাজগুলোর জন্য বিভিন্ন সংস্থা, ক্লাব, সংগঠন তৈরি হয়েছে। আর অনেক সাধারণ মানুষ এসব কাজে তার জীবনটাই কাটিয়ে দিচ্ছে।

শরিয়ত তো আমাদের এই অতিরঞ্জনকে কখনোই অনুমোদন করে না।

আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এসব বিনোদনমূলক খেলাধুলার প্রধানতম একটি খেলা, যেটা দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে, সেটা হলো বল খেলা। হোক সেটা ক্রিকেট বা ফুটবল।

এমনকি এসবের জন্য সকল বেতার, টিভি, পত্রিকা আলাদা পাতা-কলাম ও আলাদা সময় বরাদ্দ করে রেখেছে। এর চেয়ে আরও এগিয়ে কিছু পত্রিকা, চ্যানেল চব্বিশ ঘণ্টা খেলার সংবাদই পরিবেশন করে থাকে। অর্থাৎ, এ কাজের জন্যই সেগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। হায় আফসোস!

মিডিয়াগুলো শুধু খেলার সম্প্রচার করেই তাদের কাজ শেষ করে না; বরং এসবের ওপর তারা আরও কিছু আয়োজন করে থাকে। টক শো, সাক্ষাৎকারসহ অনুভব-অনুভূতি প্রকাশের আরও নানান অনুষ্ঠান পরিচালনা করে।

পরিশেষে মিডিয়ার এসব কর্মকাণ্ডের প্রভাব সাধারণ মানুষের জীবনে কতটা ভয়াবহ রূপে বিদ্যমান তা একটু ভেবে দেখুন! সব কার্যক্রম এমনকি ইবাদত- বন্দেগি ছেড়ে দিয়ে তারা খেলার জন্য টেলিভিশনের সামনে বসে থাকে! একেক জন একেক দলের পক্ষ নেয়। এটা নিয়ে পরস্পর তারা বাজি ধরে, জুয়া খেলে। দলের জিতে তারা বিজয়মিছিল বের করে। দলের হারে তারা মন খারাপ করে বসে থাকে। পক্ষাবলম্বনের রেশ ধরে কখনো তারা মারামারিতেও লিপ্ত হয়ে পড়ে!

হায়, তারা যদি এই সময়গুলোকে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের ব্যয় করত! পড়াশোনা করি ইলম অর্জন করত!**[৪৩]

❖ সাহসিকতা তৈরি এবং আক্রমণে দক্ষতা সৃষ্টির জন্য তিনি ছোটদের সামরিক প্রদর্শনী করেছেন

সামুরা বিন জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার আম্মা বিধবা হওয়ার পর মদিনায় আসেন। লোকেরা তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিল। তিনি বললেন, আমি সে পুরুষকেই বিয়ে করব যে আমার এতিম ছেলেটির দেখাশোনা করবে। অতঃপর এক আনসারির সাথে তিনি বিয়ে বসলেন।

তিনি (জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, প্রতিবছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আনসারি বালকদের উপস্থিত করা হতো। তাদের মধ্যে পরিণতদের তিনি সৈন্যবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করতেন। আমাকেও এক বছর উপস্থিত করা হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক বালককে গ্রহণ করলেন এবং আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল, তাকে গ্রহণ করলেন আর আমাকে ফিরিয়ে দিলেন! আমি যদি তার সাথে কুস্তি লড়ি তবে তাকে ভূপাতিত করে ফেলব!' রাসূল বললেন, 'তাহলে লড়ো কুস্তি।' কুস্তি লড়ে আমি তাকে ফেলে দিলাম। রাসূল আমাকেও সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। [হাকেম : ২৩৫৬; বায়হাকী : ১৭৫৭৮৮]

সেনাসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য, মুজাহিদ গ্রহণের জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই পদ্ধতি বালকদের মাঝে উৎসাহ এবং উদ্দ্যম তৈরি করত। গ্রহণযোগ্য হওয়ার অভিলাষ তাদের তাড়িত করত। যেসব বালক অনুমতি পেত না তারা মন খারাপ করত এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি শুরু করত। যাদের গ্রহণ করা হতো তারা আল্লাহ তাআলার জন্য জীবন দিতে ব্যগ্র হয়ে উঠত। দ্বীন ও ইসলামের কালিমা বুলন্দ করার জন্য তারা অবলীলায় জীবন উৎসর্গ করত।**[৪৪]

❖ শিশুরা যখন অভিভাবক

আমার ছেলের একটি অভিযোগ হলো, 'সবসময় আম্মু একাই কেন সংসারের সব সিদ্ধান্ত নেবে?' ওর কথা হচ্ছে, সবাইকে একদিন করে ঘরের কর্তা হতে হবে। তা না হলে অন্তত একদিন ওর বাবাকে আর একদিন ওকে এই ক্ষমতা দেওয়া উচিত।

অনেক আশা নিয়ে বাবার কাছে এই প্রস্তাব উত্থাপন করল ও। কিন্তু ওর বাবা বললেন, সংসারের ব্যাপারে আমাদের দুজনের চেয়ে তোমার আম্মুর জ্ঞান অনেক বেশি। এই বিষয়ে কর্তৃত্বের আসন তাই আম্মুরই থাক। তোমার শখ হলে তুমি আন্দোলন করো, আমি কিন্তু এসবের মধ্যে নেই।

বাবাকে অনেক বুঝিয়ে রাজি করাতে না পারলেও সে মোটেই দমে গেল না। নিজের দাবি নিয়ে আমার সঙ্গে বচসা শুরু করে দিল। একদিন পেটব্যথার কারণে ঔষধ খাচ্ছিলাম। বলল, আম্মু, এমন কি কোনো ঔষধ আছে, যা খেলে মানুষের রাগ কমে যায়? প্রশ্ন করলাম, কেন? জবাব দিল, তাহলে তোমাকে ওই ঔষধ একটা খাইয়ে দিতাম, তাহলে তুমি সবসময় হাসতে আর আমি যা বলতাম, তাই মেনে নিতে।

এরপর আমাদের তিনজনের সংসারের ছোট্ট পারিবারিক বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, প্রতি শনিবারে নাকীব (আমার ছেলে) হবে সংসারের কর্তা।

পরের শনিবার ঘুম থেকে উঠে চোখ খুলেই ও আনন্দে গদগদ হয়ে বলল, আম্মু, আজ কিন্তু সবকিছু আমার পছন্দমতো হবে।

বললাম, বলো, কী কী করতে চাও তুমি?

লাফ দিয়ে উঠে বসে বলল, আজ আমি যা যা বলব, তোমাকে সব করতে হবে, কিছুতে না করতে পারবে না। আজ তুমি সারাদিন আমার সাথে কাটাবে, ফোনে বা স্কাইপে কারও সাথে কথা বলতে পারবে না; পড়াশোনাও চলবে না। আমার সাথে বসে আমার পছন্দমতো সময় কাটাবে। আজ আমি গোশত খাব, আইসক্রিম খাব, চিপস খাব—তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। ইত্যাদি ইত্যাদি বিরাট লিস্ট বলে সে থামল।

ওর কথা শুনে আমার প্রচণ্ড মন খারাপ হয়ে গেল। কারণ আমার ধারণা ছিল, আমি আমার বাচ্চাটিকে পর্যাপ্ত সময় দিই। কিন্তু তখন বুঝতে পারলাম, আমার ধারণা ঠিক ছিল না। আমি উপলব্ধি করলাম, নিজেকে আরও ভালো মা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

বাচ্চার হাতে যখন ক্ষমতা দেওয়া হবে, তখন সে তার ইচ্ছেমতো সবকিছু করতে চাইবে, এটাই সাভাবিক। এখানে মনে রাখতে হবে, কোনো ব্যাপারে সরাসরি নিষেধ না করে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে, কেন কাজটি করা ঠিক হবে না এবং শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার তার ওপরই ছেড়ে দিতে হবে। শুধু যদি ধৈর্য নিয়ে বুঝিয়ে বলা যায়, তাহলে অধিকাংশ সময় বাচ্চারা সঠিক কাজটি করতেই আগ্রহী হয়।

আরেকটি ব্যাপার হলো, একদিনেই সব চাহিদার ভুল ধরিয়ে দেওয়া যাবে না। প্রায়োরিটি বুঝে ধীরে ধীরে তাদের চাহিদাগুলোকে সংশোধন করতে হবে। তাহলে একটা সময় দেখা যাবে, কোনো কিছু চাওয়ার আগে সে নিজেই ভেবে দেখবে চাহিদাটি যুক্তিসংগত কি না। ব্যঙ্গিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয়েছে, মাঝেমধ্যে বাচ্চাদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দেখা উচিত, ওরা কীভাবে তা প্রয়োগ করে। এর মাধ্যমে তাদের থেকে এমন অনেক বিষয় বেরিয়ে আসে, যেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু সাধারণত আমাদের নজরে আসে না। একইসঙ্গে জানা যায় তাট অভিরুচি ও উন্নতির অগ্রগতি সম্বন্ধে। তার ভুল বা অন্যায় ইচ্ছেগুলোও প্রকাশ যায় এবং খুব ধীরেসুস্থে সেগুলো সংশোধনের উপায় বের হয়ে আসে। এভাবে ভুল-সঠিকের জ্ঞানটাও বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে খুব দ্রুত ঢুকে যেতে পারে তাদের মধ্যে। ধীরে ধীরে তারা অর্জন করে নিতে পারে দায়িত্বশীলতার গুণাবলি।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, বাচ্চারা যখন অভিভাবক হয়ে শাসন করে, তখন আমরা নিজেদের ভুল পন্থা বা শব্দগুলোকে চিনে নিতে পারি। আর সবচেয়ে মজার বিষয় হলো, এই ছোট্ট ছোট্ট আব্বা-আম্মাদের শাসন-ধমক শুনে শৈশবের সোনালি দিনগুলোর আবেশ যেন ফিরে ফিরে আসে।**[৪৫]

❖ সন্তানের সাথে পরামর্শ করুন

فَبَشَّرْنَٰهُ بِغُلَٰمٍ حَلِيمٍ

“অতঃপর আমি তাকে এক স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।” [সুরা আস সাফফাত, আয়াত : ১০১]

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ إِنِّي أَرٰى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَرٰى .قَالَ يَاَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ، سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ

“অতঃপর সে যখন তার পিতার সাথে কাজ করার মতো বয়সে উপনীত হলো তখন ইবরাহিম বলল, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি জবেহ করছি, এখন তোমার অভিমত কী, বলো। সে বলল, হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা-ই করুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।” [সুরা আস সাফফাত, আয়াত ১০২]

আপনার সন্তানের সাথে পরামর্শ করুন, এতে করে যেটা হবে সেটা হলো পিতামাতার সাথে সন্তানের বোঝাপড়ার একটি সম্পর্ক তৈরি হবে। সন্তান যখন কোনো কাজে বায়না ধরবে তখন আপনি তার সাথে পরামর্শ করতে পারেন। তবে আপনাকে এ ক্ষেত্রে বিচক্ষণ হতে হবে। ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিতে হবে। আজকালকার বেশিরভাগ বাব-মাকেই এরূপ মন্তব্য করতে দেখা যায় যে, আমার সন্তান অন্য বাচ্চাদের মতো না। তারা আমাদের কথা শুনতে চায় না, আমাদের শাসন তাদের কোনো কাজে দেয় না অথা অন্যান্য বাবা-মা কত সুন্দরভাবে তাদের সন্তানদেরকে মানুষ করছে। তাদের সন্তানরা কত বাধ্য। আসলে কী জানেন, এর পেছনে বড় কারণ হলো সন্তান এবং বাবা-মায়ের সম্পর্কের ব্যবধান। এজন্য বাচ্চাদের সাথে যোগাযোগ বাড়িয়ে তুলবেন। তাদের সাথে কথা বলুন এবং পরামর্শ করুন। এতে করে তারা নিজেদেরকে আপনার কাছে প্রয়োজনীয় মনে করবে। আর অন্যদিকে আপনাদের সিদ্ধান্তগুলো তার ওপর প্রভাব ফেলবে। বাসার ছোটোখাটো সিদ্ধান্তগুলোতে তাকে জিজ্ঞেস করুন, 'তুমি কী বলো এই বিষয়ে/তোমার কী মত'-এভাবে। এতে করে তারা নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে এবং দায়িত্বশীল হয়ে উঠবে।

উদাহরণ: আপনি বাচ্চাকে নিয়ে পাবলিক প্লেসে হাঁটছেন। এমন সময় কোলে ওঠার জন্য আপনার বাচ্চা চিৎকার জুড়ে দিলো। আপনি কিন্তু সেখানে তাকে মারধর, ধমক-ধামক দিয়ে চুপ করিয়ে দেবেন না। এতে করে রাস্তায় সকলের সামনে সে লজ্জাবোধ করবে এবং তার

ভেতরে আপনার প্রতি ক্রোধ সৃষ্টি হবে। আপনি সেই সময়ে তাকে কোলে নিন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বাসায় এসে অথবা নির্জনে তার সাথে কথা বলার সুযোগ হলে তার সাথে পরামর্শ করুন, 'তুমি আজকে পুরোটা সময় আমার কোলে ছিলে। কিন্তু তুমি তো বড় হচ্ছ। তাই তোমাকে আমার কোলে দেখে আশেপাশের মানুষগুলো তোমাকে ভালো বলেনি। আপনার সন্তানের উত্তর শুনবেন এবং সে অনুযায়ী তাকে নসিহা করবেন। তাকে অবশ্যই লজ্জা বা বকা দেবেন না।

আপনি সন্তানের সাথে যত পরামর্শ করবেন এবং সূক্ষ্মভাবে তাদের মনে যত প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবেন, তারা ততই আপনার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করবে।**[৪৬]

❖ তিনি কখনো তাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন

শিশুকে যখন শরিয়তের নীতি অনুসারে প্রতিপালন করা হয়, সঠিক শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা হয় তখন সেই ছোট বয়সেই তার থেকে উপকার নেওয়া যায়। গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ তার হাতে অর্পণ করা যায়। ভারী কোনো কাজে তাকে পাঠানো যায়। এভাবেই সে উম্মতের একজন কর্মদক্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে ওঠে: বরং অনেক তরুণ যুবকের কর্ম ও মেধার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা উম্মতের মাঝে সজীবতা দান করেন।

হিজরতের রাতে রাসূলের বিছানায় আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর শুয়ে থাকাটা আপনার কাছে কতটা ভারী এবং গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়? কুরায়শের মারমুখী সব জোয়ানদের থেকে প্রথম যে প্রতিক্রিয়া ঘটার আশঙ্কা ছিল সেটা হলো আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করা! আলি তখন সদ্য যৌবনে পা রাখা এক টগবগে যুবক। তার বয়স ছিল আঠারো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছিলেন, 'আমার বিছানায় ঘুমিয়ে থাকো। এই হাযরামি সবুজ চাদর ভাজ করে তার ভেতর ঘুমাও। তুমি অপছন্দ করো এমন কিছু তাদের থেকে তোমার ওপর আপতিত হবে না।'

এরপর কাফিরদের অজান্তেই রাসূল বেরিয়ে গেলেন। দরজার ফাঁক গলে তারা আলিকে শুয়ে থাকতে দেখে বলল, 'আল্লাহর শপথ, এই তো, মুহাম্মাদ চাদরে আবৃত হয়ে এখনো ঘুমিয়ে আছে। রাতে তারা আর ঘাঁটল না। ভোর হয়ে গেল। আলি বিছানা ছেড়ে উঠেই তাদের হাতে গিয়ে পড়লেন। তারা তাকে রাসূলের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, তাঁর ব্যাপারে আমার জানা নেই। [যাদুল মাআদ লি ইবনিল কাইয়িম : ২/৫২; সিরাত ইবনু হিশাম : ৩/৮]

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এত ভয়ংকর এবং বিপজ্জনক পদক্ষেপ মেনে নিতে কিসে উদ্বুদ্ধ করল! এটা অবশ্যই ইসলামি তরবিয়তের ফলাফল। যেই তরবিয়ত তাকে রাসূলের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে সাহস জুগিয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাকে বাঁচিয়েছেন যেমনভাবে তিনি রাসূলকে বাঁচিয়েছেন।

উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শামের উদ্দেশ্যে একটি বাহিনী তৈরি করলেন এবং তাকে তার সেনাপতি বানিয়ে দিলেন। এটা সেই

বাহিনী যে বাহিনীতে ছিলেন আবু বকর এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মতো মহান সাহাবিরা! [সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২/৫০০]

যাহাবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, উসামা বিন যায়েদের বয়স ছিল তখন মাত্র আঠারো বছর!

সুতরাং হে আমার সন্তানের প্রতিপালনকারী ভাই/বোন, চোখ খুলে একটু দেখুন। উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো একজন নবীন যুবককে রাসূল কত বড় দায়িত্ব দিয়েছেন! এমন এক বাহিনীর সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ করেছেন যার ভেতর বড় বড় অনেক সাহাবি ছিলেন। উমরও সম্বোধন করার সময় তাকে বলতেন, 'হে আমির, আপনার ওপর শান্তি অবতীর্ণ হোক। রাসূল ইন্তিকাল করলেন তখনো আপনি আমার আমির ছিলেন!' [প্রাগুক্ত]

কেউ কি এ কথা বলতে পারে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ক্ষেত্রে সৌজন্য দেখিয়েছেন!

মনে রাখা উচিত, সৈন্যদের নেতৃত্ব সৌজন্যের জায়গা নয়। এক পক্ষের সৈন্যরা অপর পক্ষের সেনাপ্রধানকে হত্যা করার জন্য বিশাল পরিকল্পনা সাজিয়ে থাকে। চিন্তা করে বলুন দেখি, এটা কি সৌজন্য দেখানোর জায়গা? আল্লাহর শপথ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কোনো ক্ষেত্রেই কারও প্রতি স্বজনপ্রীতি করেননি; বরং এর বিপরীতটাই তিনি করেছেন। উসামা রাদিয়াল্লাহ আনহুকেই তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যখন এক কুরায়শি মহিলার জন্য উসামা সাজা লাঘবের সুপারিশ করেছিলেন। রাসূল তাকে বলেছিলেন, 'তুমি কি আল্লাহ তাআলার হদের ব্যাপারে সুপারিশ করছ!'

এরপর রাসূল দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন:

يا أيها الناس ! انما ضل من قبلكم أنهم كانوا اذا سرق الشريف تركوه ،واذا سرق الضعيف فيهم اقاموا عليه الحد ،وأيم الله ،لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها

"হে লোক সকল, তোমাদের আগের জাতিগুলো এ কারনেই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, যখন তাদের অভিজাত কেউ চুরি করত তখন তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন তাদের দুর্বল কেউ চুরি করত তখন তার ওপর তারা হদ কায়েম করত। আল্লাহর শপথ, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদও যদি চুরি করে তাহলে মুহাম্মাদ তার হাত কেটে দেবে!" [বুখারি, হুদুদ অধ্যায়: ৬২৯০]

আলী এবং উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার উপরিউক্ত গুরুদায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়েছে শরীয়তের নির্দেশনা মেনে গড়ে ওঠার কারণেই।**[৪৭]

❖ সৎ শিক্ষক নির্বাচনের প্রতি তিনি গুরুত্বারোপ করেছেন

একজন শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের মাঝে সহাবস্থানের সময়টি বেশ দীর্ঘ হয়। অনুসরণ, অনুকরণ, শাসন, বন্ধুতা ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থার চর্চা নিয়ত সে সময়ের মাঝে ঘটতে থাকে। এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৎসঙ্গ এবং উত্তম সঙ্গী নির্বাচনের আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل

"মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের ওপর উত্থিত হবে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকে লক্ষ করো কার সাথে বন্ধুতা হচ্ছে।"

ইমাম মুহাম্মাদ বিন সিরিন রহিমাহুল্লাহ বলেন:

إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم

"এই ইলম হলো দ্বীন। সুতরাং তোমরা ভালোভাবে দেখে নাও কার থেকে দ্বীন গ্রহণ করছ।" [মুসলিম, মুকাদ্দিমা : ১/১৪; আত তামহিদ লি ইবনি আব্দিল বার : ১/৬৭]

মাওয়ার্দি রহিমাহুল্লাহ বলেন, শিক্ষক বা প্রশিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সেই চেষ্টাটা করা আবশ্যক যেই চেষ্টা করা হয় ধাইমা নির্বাচনের ক্ষেত্রে। (অর্থাৎ শিশুর সুস্বাস্থ্য এবং পুষ্টির জন্য যেমন অভিজ্ঞ ধাত্রী আবশ্যক, তেমনি ইলম অর্জনের জন্যও প্রয়োজন দক্ষ এবং প্রাজ্ঞ শিক্ষক।) একজন ছাত্র তার শিক্ষকের কাছ থেকে স্বভাব, আচরণ, চরিত্র ইত্যাদি গ্রহণ করে থাকে, যতটা না গ্রহণ করে তার বাবার কাছ থেকে। কেননা, বাবার কাছে অবস্থানের চেয়ে শিক্ষকের কাছে তার অবস্থানের সময়টা হয়ে থাকে অনেক বেশি।

আমাদের সালাফ তাঁদের সন্তানদের জন্য শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সবিশেষ যত্ন নিতেন। যদি এ জন্য সফরের দরকার হতো বা দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার প্রয়োজন পড়ত তারা তা-ই করতেন।

বর্ণিত আছে, উতবা বিন আবু সুফিয়ান তার সন্তানের প্রশিক্ষককে বলেন, "হে আব্দুস সামাদ, সর্বপ্রথম আপনি নিজের সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি দেবেন। কেননা, তাদের দৃষ্টি আপনার চোখে নিবদ্ধ থাকবে। তারা সেটাকেই ভালো মনে করবে আপনার চোখ যেটাকে ভালো দেখবে।

সেটাকেই মন্দ মনে করবে যেটাকে মন্দ দেখবে আপনার চোখ। তাদের আল্লাহ তাআলার কিতাব শিক্ষা দিন। তাদের চাপাচাপি করবেন না, এতে তারা বিরক্ত হয়ে পড়বে। তাদের পরিত্যাগ করবেন না। তারাও আপনাকে ত্যাগ করবে না। উত্তম কবিতার পঙ্ক্তি তাদের শেখান। শ্রেষ্ঠ হাদিসগুলো তাদের মুখস্থ করান। একটা বিষয় ভালোভাবে বুঝে না উঠা পর্যন্ত অন্য বিষয়ে চলে যাবেন না। আমার কথা বলে তাদের ভয় দেখাবেন। তবে শাসন করবেন আমাকে ছাড়া। তাদের জন্য সেই উত্তম চিকিৎসকের মতো হয়ে যান যিনি রোগ ভালোভাবে জেনে নেওয়ার পর ঔষধ প্রয়োগ করেন। শাসকদের ইতিহাস তাদের পাঠ করান। নারীদের গল্প তাদের সামনে করবেন না।" [নাসিহাতুল মুলুক লিল মাওয়ার্দি : ১৭২]

আবু শামাহ আশ শাফিয়ি রহিমাহুল্লাহ তার গ্রন্থ 'মাজমুউর রাসাইল'-এ ছোটদের শিক্ষকের আচরণবিধি সারাংশ আকারে উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেছেন, 'শিক্ষক সর্বপ্রথম নিজেকে সংশোধন করে নেবে। কেননা, ছাত্রদের চোখগুলো তার দিকে চেয়ে থাকবে। তাদের কানগুলো তার প্রতি উৎকর্ণ থাকবে। তিনি যেটাকে ভালো বলবেন, তারা সেটিকেই ভালো মনে করবে। তিনি যেটাকে খারাপ দেখবেন, তারাও সেটাকে খারাপ ভাববে। ছাত্রদের সামনে ভাবগাম্ভীর্য ধরে রাখবে। গাম্ভীর্যের প্রভাবেই তাদের অধিকাংশ শাসন গ্রহণ করে নেবে। শাস্তি এবং প্রহারের ক্ষেত্রে কখনোই অতিরঞ্জন করবে না। সবার সামনে কাউকে নিয়ে ঠাট্টা করবে না। গিবতকে তাদের কাছে নোংরা হিসেবে তুলে ধরবে। মিথ্যা এবং চোগলখোরির প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে তুলবে।' [আত তারবিয়্যাতুল ইসলামিয়া : ১৩৯]**[৪৮]

❖ শিক্ষকের প্রতি ভালোবাসা

একদিন ক্লাসে হঠাৎ একটা বাচ্চার পেটব্যথা শুরু হলে সে মেঝেতে শুয়ে ছটফট করতে লাগল। স্বভাবতই এই দৃশ্য কিছু বাচ্চার হাসির খোরাক হলো; কয়েকজন প্রশ্ন করল, ও কি এখন মারা যাবে? কেউ কেউ ছুটে এলো বন্ধুর পাশে এবং অন্যরা যার যার সিটে নির্বিকার বসে রইল। বাচ্চাটি সুস্থ হওয়ার পর শিক্ষক বললেন, যারা সাহায্যের জন্য ছুটে এসেছিল, তারা ছাড়া বাকি সবার আজ টিফিন বন্ধ। কেউ টিফিন পিরিয়ডে পার্কে যেতে পারবে না। বাচ্চারা সবাই চিৎকার করে বলে উঠল, আমরা তো কিছুই করিনি স্যার! তাহলে আমাদের শাস্তি দিচ্ছেন কেন?

শিক্ষক বললেন, তোমাদের অন্যায়-তোমরা তোমাদের বন্ধুর বিপদে ছুটে আসোনি, তার কষ্টে সমব্যথী না হয়ে বরং হেসেছ, সান্ত্বনা বা আশ্বাস দেওয়ার বদলে 'মারা যাবে' বলে ওকে আরও ঘাবড়ে দিয়েছ। একবার ওর জায়গায় নিজেকে চিন্তা করে দেখো তো! ভাবো, তুমি কষ্টে ছটফট করছ আর কেউ তোমার দিকে তাকিয়ে হাসছে, তুমি ব্যথা পাচ্ছ আর পাশ থেকে কেউ একজন বলছে, 'তুমি এখন মারা যাবে।' বাচ্চারা তাদের শিক্ষকের কথা শুনে চুপ হয়ে গেল।

যারা সিটে বসে ছিল, তাদের একজন বলল, আমরা তো কিছু করিনি স্যার, আমরা চুপচাপ বসে ছিলাম।

শিক্ষক বললেন, অন্যের কষ্ট আর বিপদ দেখে তোমাদের মনে এতটুকু দয়া-মায়া সৃষ্টি হয়নি, এটা তো সবচেয়ে বড় অন্যায়। মনে রেখো, তুমি অন্যের সাথে যে আচরণ করবে, তোমার সাথেও সেই আচরণই করা হবে। আজ তুমি অন্যের কষ্ট দেখে হাসছ, কাল তোমার কষ্টে অন্যরা হাসবে। আজ তুমি কাউকে সাহায্য করতে কার্পণ্য করলে, কাল তোমার বিপদে কেউ এসে পাশে দাঁড়াবে না। এখানে তোমরা সবাই বন্ধু। একসাথে পড়বে, খেলবে, হাসবে, একের বিপদে অন্যকে সাহায্য করবে। আর যদি এমন না করো, তাহলে কখনোই তোমরা ভালো মানুষ হতে পারবে না। এখন বলো, তোমাদের কি মনে হচ্ছে, তোমরা ভুল করেছ?

সবাই স্বীকার করে নিল, তারা ভুল করেছে। শিক্ষক বললেন, এখন যদি আমি তোমাদেরকে শাস্তি না দিই, তাহলে তোমরা এই ভুলটা মনে রাখতে পারবে না এবং আবারও যখন এমন

কোনো পরিস্থিতি আসবে, একই ভুল করবে। বাচ্চারা তখন খুশিমনে নিজেদের শাস্তি মেনে নিল।

এমন অনেক বাচ্চা আছে, যারা বাবা-মা বা পরিবারের কারও কোনো আদেশ শোনে না; কিন্তু সেই একই আদেশ যদি স্কুলের টিচাররা করেন, বিনাবাক্যে তা মান্য করতে রাজি হয়ে যায়।

এর কারণ কী হতে পারে? বাচ্চারা কেন টিচারদের কথা শোনে? কেন তাদের টিচারদের ভালোবাসে? এর কারণ হলো, শিক্ষকরা তাদের কথা, কাজ ও আচরণের মাধ্যমে বাচ্চাদের থেকে ভালোবাসা অর্জন করে নেন।

টিচিং কোর্স করার সময় বলা হয়ে থাকে, টিচারদের প্রতি ভালোবাসা বাচ্চাদেরকে পড়াশোনার প্রতি অনেক বেশি উৎসাহিত করতে পারে। তাদের মনে যদি এই বিশ্বাস তৈরি করা যায়, টিচাররা তাদেরকে ভালোবাসেন বলেই পড়তে বলেন: তাদের ভালো চান বলেই প্রয়োজনে বকা বা শাস্তি দেন, এর ফলে তাদেরই উপকার হয়—তাহলে স্কুল ও পড়াশোনার প্রতি বাচ্চাদের আগ্রহ অনেক বেশি থাকে। এই চমৎকার আইডিয়াটা কিন্তু পারিবারিক জীবনেও অ্যাপ্লাই করা যায়। বাচ্চার মনে যদি বাবা-মা আর পরিবারের লোকজন এই বিশ্বাস ও ভরসা তৈরি করতে পারেন, তারা যা বলেন তার উপকার ও মঙ্গলের জন্যই বলেন, তাহলে এসব কারণে তার মনে রাগ, ক্ষোভ বা হতাশা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ অনেক কমে যাবে।

'বাবা-মা যা করছেন, আমার ভালোর জন্য করছেন। আমার প্রতি ভালোবাসা থেকেই করছেন।'-বাচ্চার মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করার দায়িত্ব বাবা-মাকেই পালন করতে হবে। কথা, কাজ ও আচরণ দিয়ে বাচ্চার কাছে নিজেদেরকে কল্যাণকামী হিসেবে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে।**[৪৯]

❖ শিশুদের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে জ্ঞানপিপাসা

অজানাকে জানার আগ্রহ কমবেশি সবার মধ্যেই থাকে। আর এই অজানাকে জানার সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হচ্ছে বই। শিশুদেরকে বইয়ের ভুবনের সাথে পরিচর করে দেওয়ার দায়িত্ব বাবা-মাকেই পালন করতে হয়। জ্ঞান-পিপাসার বীজটি দেন ডালপালা মেলে মহিরুহে পরিণত হতে পারে, সেজন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দিতে হয়। যেকোনো কাজ করার আগে যদি কাজটির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গন্তব্য সম্পর্কে ধারণা থাকে, তাহলে সেটি করে যাওয়া মানুষের জন্য অনেক সহজ হয়। ঠিক তেমনই 'বই কেন পড়বে', 'বই পড়লে কী হবে', 'না পড়লে কী হবে' ইত্যাদি বিষয়গুলো যদি সুন্দর করে শিশুদেরকে বুঝিয়ে বলা যায়, তাহলে তার মনেও জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে।

বাবা-মায়েরা বাচ্চার ছয় মাস বয়স থেকেই বিভিন্ন ধরনের ছবির বই কিনে দিতে পারেন। ছবি দেখিয়ে বলবেন, কোনটার নাম কী। এভাবেই ধীরে ধীরে বইয়ের সাথে ওর বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকে নিয়মিত ওকে লাইব্রেরিতে নিয়ে গিয়ে ওর পছন্দমতো বই কিনে দেওয়ার মাধ্যমে আমরা ওর মনে জ্ঞানার্জনের প্রতি ভালোবাসা তৈরি করতে চেষ্টা করতে পারি। বিকেলের কিছুটা সময় এবং রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে অবশ্যই বিভিন্ন ধরনের গল্পের বই পড়া বাচ্চাদের প্রতিদিনের রুটিনের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। কিন্তু শুধু এটুকুর মধ্যেই জ্ঞানার্জন সীমাবদ্ধ না। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর ক্লাসের পড়া ও হোমওয়ার্ক করা হয়ে গেলে যেন বাচ্চা যখন ইচ্ছে বই পড়তে পারে, সেই পথ উন্মুক্ত রাখা।

নাকীব একদিন জানতে চেয়েছিল, আম্মু, এত বই কেন পড়ব? কী হবে বই পড়ে? জবাবে তার মা বলেছিলেন, তুমি জানো পৃথিবীতে মানুষের আনাগোনা শুরু হয়েছিল আজ থেকে অনেক অনেক বছর আগে। পৃথিবীর শুরু থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত যুগে যুগে কত শত জ্ঞানী-গুণী এসেছেন। আমাদের মতো তারাও অনেক অনেক মজা করেছেন। এখন আমরা তো অতীতে ফিরে যেতে পারব না, তবে যদি তাদের সেসব বই পড়ি, তাহলে জানতে পারব, তারা কী কী করেছেন। নতুন অনেক কিছু দিখতে পারব, অন্যকেও শেখাতে পারব। এই যে তুমি ডাইনোসর এত পছন্দ করো, যদি বই না পড়তে, তাহলে কি জানতে পারতে ডাইনোসর সম্পর্কে? ডাইনোসরের প্রসঙ্গ উঠতেই নাকীব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রতিটা শিশু যেমন আলাদা, তাদের পছন্দ-ভালোলাগাও আলাদা। তাই সন্তান যেভাবে বুঝবে, তাকে সেভাবেই বোঝাতে হবে। এতে শিশুরা যেকোনো কিছুর সঙ্গে সহজে পরিচিত হতে পারবে। তাই বাবা-মায়ের নিরলস চেষ্টা সন্তানদের মনে জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলা সম্ভব।

বই একটি অদ্ভুত মিরাকল। বইয়ের আছে পাখির মতো ডানা। বই আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে আমরা যেখানে যেতে চাই তার সেখানে। বইয়ের পিঠে সওয়ার হয়ে আমরা ঘুরে বেড়াতে পারি পৃথিবীর আনাচে-কানাচে, গহিন জঙ্গলে, গভীর সমুদ্রে, বহু আলোকবর্ষ দূরের কোনো গ্রহে, চন্দ্রে; এমনকি ব্ল্যাকহোলের ভেতরেও। যারা কোনো দিনও নিজ দেশের বাইরে যেতে পারবে না, তারাও বইয়ের পাতায় চোখ রেখে দেখতে পারে পৃথিবীর সুউচ্চ শৃঙ্গ হিমালয়, পিরামিড, নীলনদ আরও অনেক ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনা। বইয়ের পাতায় নজর বুলিয়ে ঘুরে আসতে পারে মরুভূমির সেই পথ, সেই গুহা-যা একসময় আলোকিত ছিল আমাদের প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্পর্শের আলোয়, যেখানে রচিত হয়েছিল মুসলিমদের প্রথম বিজয়ের উপাখ্যান।

বইয়ের মাধ্যমে সহজেই আমরা ঘুরে আসতে পারি স্পেনের সেই উপকূল, যেখানে ইসলামের নিশান উড়িয়েছিলেন তারিক ইবনু যিয়াদ। বইয়ের মাধ্যমে শোনা যায় মুসলিম সৈন্যদের শৌর্যবীর্য দেখে রাজা রডারিককে পাঠানো সেনাপতি থিওডমিরের সেই বার্তা- 'সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও অদ্ভুত শৌর্যবীর্যের অধিকারী মুসলিম বাহিনীর অগ্রগতি আমি রখতে পারলাম না।'ইতিহাস আসলে কী? ইতিহাস হচ্ছে যেকোনো জাতির দর্পণ, যে দর্পণের আলোতে জাতি লাভ করে আত্মপরিচয়ের সৌভাগ্য, যার মাধ্যমে তারা পায় চলার পথের সন্ধান, প্রেরণা ও দিক-নির্দেশনা। বইয়ের কল্যাণে আমরা জানতে পারি আমাদের অতীত ইতিহাস, যেই ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়ানো রয়েছে আগামীর জন্য শত সহস্র শিক্ষা।

মুসলিম বিশ্বের বিপর্যয়ের কারণসমূহ পড়তে গিয়ে জেনেছিলাম, এ বিপর্যয়ের মূলে আছে তিনটি বড় কারণ। সেগুলো হলো-আদর্শবিমুখতা, বিজ্ঞানবিমুখতা এবং ইতিহাসবিমুখতা। মুসলিমদের আদর্শিক চেতনা ততদিন পর্যন্ত জাগ্রত হবে না, যতদিন তাদের মধ্যে গভীর ইতিহাস-চেতনা সঞ্চারিত না হবে। কারণ ইতিহাস না জানা থাকলে মুসলিমরা নিজেদের প্রকৃত শত্রু-মিত্রকে চিনতে পারবে না। জানতে পারবে না ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে কত ছদ্মবেশে, কত কৌশলে, কত রঙে, কত রূপে শত্রুরা মুসলিম জাতিকে বিভ্রান্ত করেছে, ধোঁকা দিয়েছে এবং বিপর্যস্ত করেছে। আমাদের সন্তানদেরকে আদর্শ মুসলিম হিসেবে গড়ে

তুলতে চাইলে তাদেরকে জানাতে হবে ইসলামের সঠিক ইতিহাস। আর সেজন্য অবশ্যই তাদেরকে বেশি বেশি বই পড়াতে হবে।**[৫০]

❖ সন্তানের বেড়ে ওঠা, যোগ্য হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে আবশ্যিক দিকগুলোর যত্ন নেওয়া দরকার

যে বিষয়টি কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়া যাবে না সেটা হলো, সন্তানকে ফরজে আইন পরিমাণ ইলম শিক্ষা দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে যদি অভিভাবক অবহেলা করে তাহলে তাকে জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। ফরজে আইন বিষয়গুলোর মধ্যে আছে তাহারাত, সালাত, সিয়াম, হজ্ব, মা-বাবার আনুগত্য ইত্যাদি। ছোট থেকেই সন্তানকে এসব বিষয় শেখাতে থাকলে বুঝ-বুদ্ধির পক্কতা আসার পর তার অন্তর ইলমের স্বাদ অনুভব করতে শিখবে।

অতঃপর সে যদি শরঈ ইলম শিখতে আগ্রহী হয় তাহলে তাকে ইলম অর্জনের যাবতীয় উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সঠিক, বিজ্ঞ এবং দূরদর্শী একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তাকে অর্পণ করতে হবে। শিক্ষক তার স্বভাব, বুঝ এবং ধারণক্ষমতা পর্যালোচনা করে তাকে নির্দেশনা দিতে থাকবে। একটা সময় পর সে একজন ভালো আলিম হয়ে উম্মতের উভজাগতিক কল্যাণ সাধনের কাজে নিয়োজিত হবে।

আর যদি তার আগ্রহ শরঈ বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বৈধ ব্যাপারে দেখা যায় তাহলে সে বিষয়ে অভিজ্ঞ কারও হাতে তাকে অর্পণ করতে হবে এবং সেই বিদ্যা অর্জনের সার্বিক উপায়-উপকরণ তাকে সরবরাহ করবে।

যে বিষয়ে যার আগ্রহ নেই এবং সে বিষয়ের ধারণক্ষমতাও তার মাঝে নেই, এ ক্ষেত্রে তাকে চাপাচাপি বা জোরাজুরি না করা উচিত। এতে তার মানসিকতা বিগড়ে যাবে এবং সে বঞ্চিত হবে সেটা থেকে যেটার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।**[৫১]

❖ উপসংহার

এত কিছুর পর একটা কথা না বললেই নয়। হতে পারে আপনি ওপরে বলে আসা সবকিছুই করলেন, এমনই আরও অনেক কিছুই করলেন, এরপরেও আপনার সন্তানটি ঠিক তেমন মানুষ হলো না, যেমনটা আপনি চেয়েছিলেন। খুব নেতিবাচকভাবে যদি বলি ধরে নিই উচ্ছনে গেল, অধঃপতনের সীমায় চলে গেল, সে ক্ষেত্রে কী করবেন বলুন তো?

মাথা চাপড়ে হা-হুতাশ করবেন? নিজেকে ব্যর্থ ভাববেন?

একেবারেই না। নিয়তি ওপর থেকে নির্ধারিত। আমাদের কাজ শুধু আল্লাহর আদেশ মেনে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাওয়া। চোখ বন্ধ করে যদি বলতে পারি,

ইয়া রব, আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। কিন্তু ফলাফল পাইনি।

তাহলেই হবে।

কারণ, আল্লাহ আমাদের চেষ্টাটুকুই দেখেন, ফলাফল তিনিই দেবেন। এই জীবনে কিংবা অনন্ত জীবনে। আমাদের নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে গেছিলেন যেন তার চাচা যাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু পারেননি। সেটা আল্লাহর ইচ্ছা এবং আমাদের জন্য শিক্ষা। তাই সফল হোন আর নাই বা হোন; হতাশার জায়গা নেই। চেষ্টা করতে পারা মানেই সফলতা।**[৫২]

❖ তথ্যসূত্র

পাঠ্যসূচি

**[১] মায়েদের প্যারেন্টিং : ১৩

**[২] মায়েদের প্যারেন্টিং : ২২

**[৩] মায়েদের প্যারেন্টিং : ২৩

**[৪] প্যারেন্টিং স্কিলস : ২৩

**[৫] প্যারেন্টিং স্কিলস : ৭৬

**[৬] প্যারেন্টিং স্কিলস : ৮০

**[৭] নববি তরবিয়ত : ১৩৫

**[৮] প্যারেন্টিং স্কিলস : ৮৫

**[৯] নববি তরবিয়ত : ৯১

**[১০] কোরআন-সুন্নাহর আলোকে প্যারেন্টিং : ২৮৪]

**[১১] নববি তরবিয়ত : ১৩৮

**[১২] কোরআন-সুন্নাহর আলোকে প্যারেন্টিং : ২৮৫

**[১৩] নববি তরবিয়ত : ১২৭

**[১৪] মায়েদের প্যারেন্টিং : ২৬

**[১৫] মায়েদের প্যারেন্টিং : ৫৫

**[১৬] মায়েদের প্যারেন্টিং : ২৮

**[১৭] প্যারেন্টিং স্কিলস : ২৮

**[১৮] প্যারেন্টিং স্কিলস : ২৯

**[১৯] প্যারেন্টিং স্কিলস : ৩১

**[২০] মায়েদের প্যারেন্টিং : ৩২

**[২১] মায়েদের প্যারেন্টিং : ৬০

**[২২] মায়েদের প্যারেন্টিং : ১০৯

**[২৩] প্যারেন্টিং স্কিলস : ৩৭

**[২৪] প্যারেন্টিং স্কিলস : ৭০

**[২৫] প্যারেন্টিং স্কিলস : ৪৮

**[২৬] মায়েদের প্যারেন্টিং : ১৪৭

**[২৭] মায়েদের প্যারেন্টিং : ১৬৬

**[২৮] মায়েদের প্যারেন্টিং : ১৬৮

**[২৯] মায়েদের প্যারেন্টিং : ১৬৪

**[৩০] মায়েদের প্যারেন্টিং : ৪৯; প্যারেন্টিং স্কিলস : ৮৬

**[৩১] প্যারেন্টিং স্কিলস : ২৫

**[৩২] মায়েদের প্যারেন্টিং : ৫৮

**[৩৩] মায়েদের প্যারেন্টিং : ৪১

**[৩৪] মায়েদের প্যারেন্টিং : ৯০

**[৩৫] প্যারেন্টিং স্কিলস : ৩৩

**[৩৬] নববি তরবিয়ত : ৬৯

**[৩৭] নববি তরবিয়ত : ১৮৬

**[৩৮] নববি তরবিয়ত : ১৭৭

**[৩৯] নববি তরবিয়ত : ২১১

**[৪০] নববি তরবিয়ত : ২০৭

**[৪১] নববি তরবিয়ত : ১৮৭

**[৪২] মায়েদের প্যারেন্টিং : ৪৬

**[৪৩] প্যারেন্টিং স্কিলস : ৬৫; নববি তরবিয়ত : ১৭৩

**[৪৪] নববি তরবিয়ত : ২০২

**[৪৫] মায়েদের প্যারেন্টিং : ৫১

**[৪৬] প্যারেন্টিং স্কিলস : ৬৮

**[৪৭] নববি তরবিয়ত : ২১৪

**[৪৮] নববি তরবিয়ত : ১৯৩

**[৪৯] মায়েদের প্যারেন্টিং : ৩৮

**[৫০] মায়েদের প্যারেন্টিং : ৮০

**[৫১] নববি তরবিয়ত : ১৭৬

**[৫২] প্যারেন্টিং স্কিলস : ৮৮